ছোটদের পৃথিবী ও পরিবেশ বিজ্ঞান

মোস্তাক আহ্‌মাদ

কমলালেবু না আপেল- কিসের মতো পৃথিবী ?

কমলালেবুর সঙ্গে আপেলের তফাৎটা কোথায় তোমরা কি জান? স্বাদের কথা অবশ্য বলছি না, বলছি আকারের কথা। কমলালেবু সামনে আর পেছনের দিকে খানিকটা টানা, লম্বাটে, আর আপেল ঐ দুদিকেই একটু চাপা।

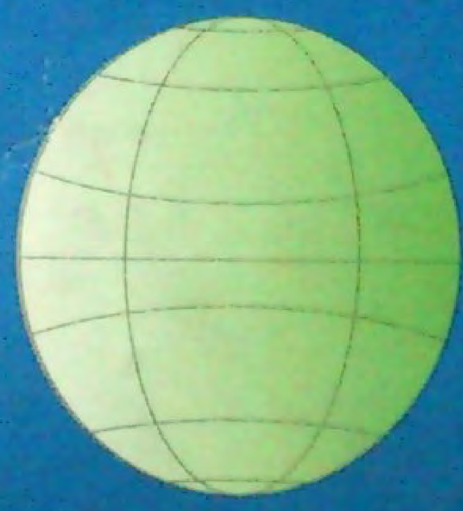

ছোটদের
পৃথিবী ও পরিবেশ বিজ্ঞান

মোস্তাক আহ্‌মাদ

ঝিনুক প্রকাশনী

ছোটদের পৃথিবী ও পরিবেশ বিজ্ঞান

মোস্তাক আহ্‌মাদ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৮

প্রকাশক
মোঃ নূরুল ইসলাম
ঝিনুক প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ
উত্তম সেন

কম্পোজ
কলি কম্পিউটার্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
জিএ প্রিন্টার্স
৩৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা–১১০০

মূল্য : ৯০.০০

SOTODER PRITHIBE O PORIBESH BIGGAN
by : Mostaque Ahmad
First Published : September 2008, by Md. Nurul Islam
JHINUK PROKASHONI, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 90.00,

ISBN-984-70112-0017-0

উৎসর্গ

যারা পৃথিবী ও পরিবেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী
সেই সকল শিক্ষার্থীদেরকে–

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৃথিবী আসলে কেমন ১৪
আমার এলাকাটাই আমার পৃথিবী ১৫
মানুষ আদি বাসস্থান ছাড়ার কারণ ১৭
মানুষ কীভাবে একসঙ্গে বসবাস করতে শিখল ১৯
পৃথিবী কি চেপ্‌টা? ২৩
জ্ঞানসাধক আর মনীষীদের পীঠস্থান ২৬
ফিনিশীয়দের ধারণা ২৮
পৃথিবী গোল–এই ধারণা প্রথম কাদের ৩০
প্রথম পৃথিবী পরিমাপ ৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরব তথা মুসলিম পর্যটকদের ধারণা ৪১
মানচিত্র উদ্ভাবন ৪২
আরবদেশীয় ভৌগোলিকের রৌপ্যমানচিত্র ৪৪
ঘরকুনোদের জন্য মানচিত্র ৪৬
দূর যাত্রার মানচিত্র ৪৮
মানচিত্র থেকে ভূগোলক ৫২
একটি ভূগোলকের কাহিনী ৫৪
পৃথিবীর আয়তন ৫৭
কমলালেবু না আপেল–কিসের মতো পৃথিবী? ৫৯
পৃথিবী নামক গ্রহের সংক্ষিপ্ত সার ৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পরিবেশ বিজ্ঞান

পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ ৬৬
মাটি দূষণ, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ৬৭
পরিবেশ ও প্রতিবেশ ৭৩
প্রতিকূল প্রকৃতি ৮৩

ভূমিকা

পৃথিবীর আকার কেমন? প্রশ্নটা অদ্ভুত বলে মনে হয়, তাই না? পৃথিবীকে ভূগোলক বলা হয়। গোলক মানে গোল। পৃথিবী গোল ছাড়া আর কেমন হবে?

পৃথিবী যে গোলাকার বিংশ শতাব্দীর মানুষ তোমার আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক আকাশের নীল রঙ, গাছপালার সবুজ রঙ। তার কারণ এই যে ছেলেবেলা থেকেই আমাদের শুনতে শুনতে অভ্যাস হয়ে গেছে যে পৃথিবীটা গোল। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই স্পষ্ট যে প্রমাণের কোন দরকার হয় না?

বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে অনেক মাথা ঘামান। নানা রকম নাম বাছাবাছি করার পর শেষকালে তাঁরা যে নামটি রাখলেন তা হল 'geoid'। শব্দটা যৌগিক। গ্রীক ভাষায় 'geo' ভূ, অর্থাৎ পৃথিবী আর গ্রীক ভাষারই শব্দ 'eidos', অর্থাৎ আকার—এই দুয়ের মিলনে এর উৎপত্তি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দাঁড়াচ্ছে ভূসদৃশ। তাহলে ঘটনাটা এই যে আমাদের পৃথিবীটা গোলক হলেও পুরোপুরি তা নয়। মানুষ কীভাবে পৃথিবীর আকার জানতে পারল সে ইতিহাস দীর্ঘ, অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। সেসব নিয়েই তোমাদেই এই বই।

পৃথিবীর পরে যে সকল বিষয় সম্পর্কে জানা দরকার তা হলো পরিবেশ। পরিবেশ নিয়ে তোমাদের জন্য রয়েছে নানাবিধ শিক্ষামূলক জ্ঞান। যা তোমাদেরকে পরিবেশ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তোমাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়–

০১৭১২-৮২৭২৬৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠ – ১.১

- পৃথিবী দেখতে কেমন। ভূপৃষ্ঠের পরিধি মাপার পর কেমন মনে হয়েছিল?
- আদিম মানুষের জীবন কেমন ছিল?
- কীভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছিল?

উদ্দেশ্য–

এই পাঠ অধ্যয়ন করে তোমরা আরও জানতে পারবে–

- জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা অজানা তথ্য।
- মানবজাতি তাদের আদি বাসস্থান ছাড়ল কেন?
- কিসের তাগিদে মানুষ এক সঙ্গে বসবাসের কথা ভাবতে লাগল।
- পৃথিবী যে চেপ্‌টা এই নিয়ে প্রথম গবেষণা করেছিল চীনারা–তাদের ফলাফল কি দাঁড়িয়েছিল?
- প্রাচীন ভারত জ্ঞান সাধক আর মনীষীদের পীঠস্থান আখ্যা পাওয়ার কারণ কী?
- পৃথিবী গোল–এই ধারণা প্রথম কারা দিয়েছিল?
- কারা কীভাবে প্রথম পৃথিবীর পরিমাপ করেছিল?

পৃথিবী আসলে কেমন?

বন্ধুরা, পৃথিবী সম্পর্কে কার না জানতে ইচ্ছে করে। পৃথিবীর আকার নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার শেষ নেই। এ নিয়ে তোমাদের প্রকৃতিতে নিয়ে যেতে চাই। সেখানে তোমরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারবে। তাহলে এবার চলে এসো কোন মাঠে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসো অনেক অনেক দূরে, মাঠের মধ্যিখানে, যাতে দূর দিগন্তের দিকে তাকালে রঙচঙে পাপড়ির ফুল আর ঘাস ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তোমার চারপাশে তাকিয়ে দেখ। কী দেখতে পাচ্ছ?– পৃথিবীর ওপরটা কি বাঁকা, ফোলা?...না তো। সেরকম কিছুই চোখে পড়ছে না। এই তো চোখের সামনে দিব্যি দেখা যাচ্ছে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো পৃথিবী। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার ওপরকার প্রতিটি ঢিবি, প্রতিটি ঝোপঝাড়। তাহলে কে বলল পৃথিবীটা গোল?

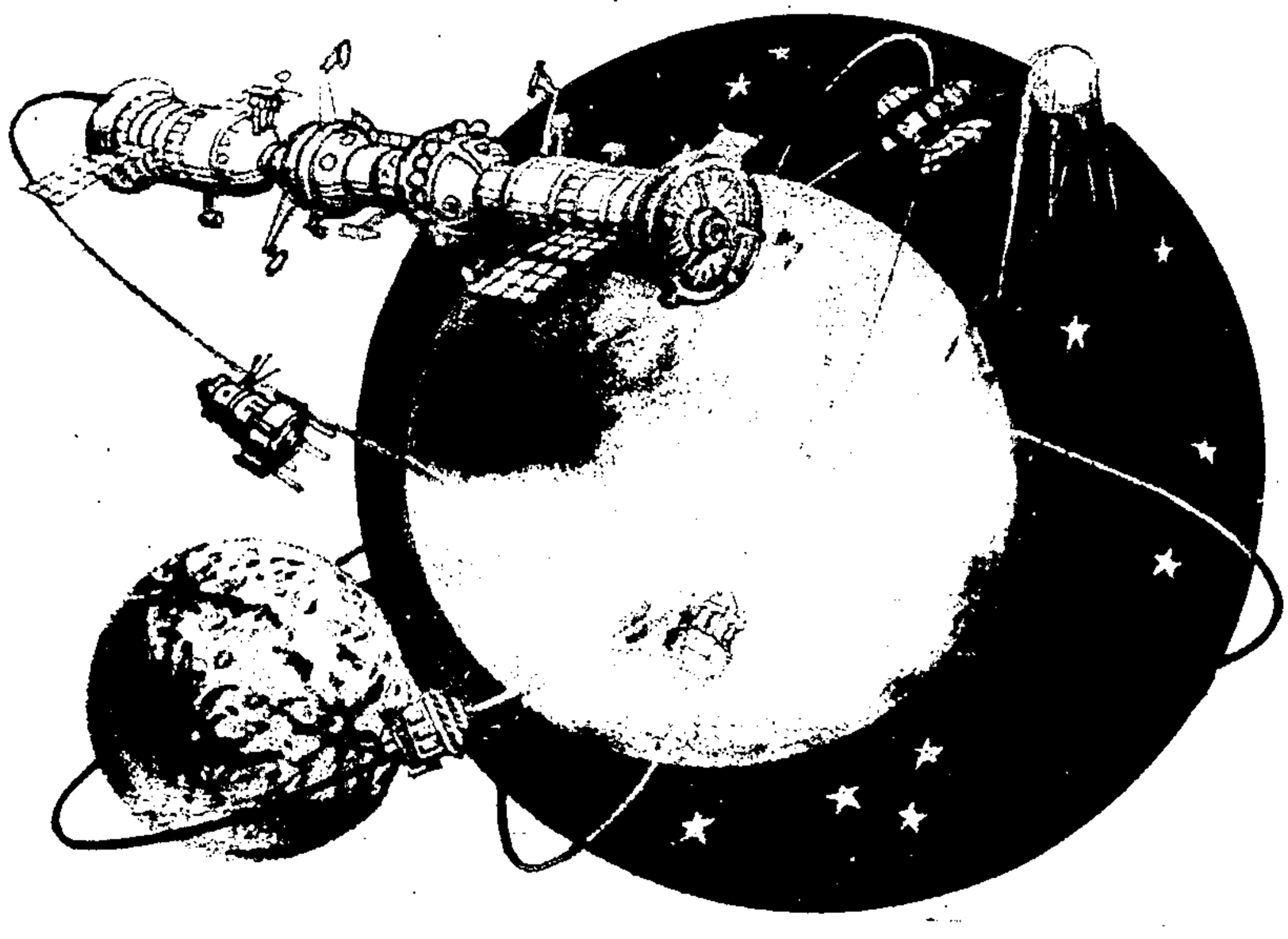

কৃত্রিম উপগ্রহের মারফত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কম্পিউটার যন্ত্রে যখন ভূপৃষ্ঠের পরিধি মাপা হল তখন দেখা গেল আমাদের গ্রহের আকার আসলে জটিল—অনেকটা নাশপাতির মতো। সুমেরুর কাছাকাছি উত্তর গোলার্ধ খানিকটা ওপর দিকে উঠে গেছে, আবার দক্ষিণ গোলার্ধ সামান্য দাবানো। পৃথিবীর গায়ে যেমন টোল আছে তেমনি আবার ফুলো ফুলো জায়গাও আছে। শুধু কি তাই? পৃথিবীকে যদি বিষুবরেখা বরাবর সমান

দু'টুকরো করে কাটা যায় তাহলেও দেখা যাবে ছেদের জায়গায় পুরোপুরি বৃত্ত না হয়ে কিছুটা যেন উঠে গেছে। সত্যিকারের নাশপাতি যাকে বলে, তাও আবার বেশ বাঁকাচোরা। কী নাম দেয়া যায় এ ধরনের আকারকে?

বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে অনেক মাথা ঘামান। নানা রকম নাম বাছাবাছি করার পর শেষকালে তাঁরা যে নামটি রাখলেন তা হল 'geoid'। শব্দটা যৌগিক। গ্রীক ভাষায় 'geo' ভূ, অর্থাৎ পৃথিবী আর গ্রীক ভাষারই শব্দ 'eidos', অর্থাৎ আকার—এই দুয়ের মিলনে এর উৎপত্তি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দাঁড়াচ্ছে ভূসদৃশ। তাহলে ঘটনাটা এই যে আমাদের পৃথিবীটা গোলক হলেও পুরোপুরি তা নয়। মানুষ কী ভাবে পৃথিবীর আকার জানতে পারল সে ইতিহাস দীর্ঘ, অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। এসব নিয়েই আমার আলোচনা।

আমার এলাকাটাই আমার পৃথিবী

কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মানুষ বেশি ছিল না। মাঠ আর বনে বসবাসকারী অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষকে দুর্বল মনে হত। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার মতো অথবা নিজের খাবার জন্য বন্য পশুপাখি শিকার করার উপযুক্ত শক্ত নখর ও ধারাল দাঁত তার ছিল না। হিম থেকে গা বাঁচানোর জন্য সর্বাঙ্গে যেমন ঘন ও গরম লোম থাকা দরকার তাও তার ছিল না। ওড়ার ডানা তার ছিল না, দাবানল বা বসন্তের বন্যা থেকে পালানোর মতো পায়ের জোরও ছিল না। থাকার মধ্যে তার ছিল যৎসামান্য বুদ্ধিবিবেচনা আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষমতা।

পৃথিবীর আদিম মানুষের জীবন ছিল কঠিন। কঠিন ছিল, ক্ষুধার তাড়না। সারাদিন ধরে নারী ও শিশুরা যোগাড় করত গাছের মূল-কন্দ আর শাকপাতা, পুরুষেরা কেউ কেউ চেষ্টা করত মাছ ধরতে, কেউ বা ছোট বড় যাই হোক কোন না কোন জন্তুজানোয়ার ধরতে। মানুষ তখন বাস করত বড় বড় পারিবারিক দল বেঁধে–বাবা-মা, ছেলেমেয়ে, চাচা-চাচী, খুড়ো-জ্যাঠা, পিসি, ভাইপো, ভাইঝি–সবাই সবার আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠী। সন্ধ্যা হতে না হতে সকলে এটা সেটা খাবারদাবার নিয়ে তাদের বাসস্থান গুহায় এসে জড় হয়। সেখানে অগ্নিকুণ্ডের ধারে গোল হয়ে বসে ভাগাভাগি করে খাবার খায়।

আদিম মানুষ দীর্ঘকাল কেবল পাথর কাঠ আর হাড় দিয়েই শ্রম ও শিকারের হাতিয়ার বানাতে পারত। পাথরের কুড়ুল বা ছুরি তৈরি করা সহজ ব্যাপার নয়। হাতিয়ারের উপযুক্ত একটা পাথরের খণ্ড খুঁজে বার করতে কত সময়ই না নষ্ট হয়! পাথরের খোঁজে নিজেদের এলাকা থেকে দূরে যেতে হত। অবশ্য এটাও ঠিক যে বড্ড বেশি দূরে তারা যেত না, তাতে পথ হারানোর আশঙ্কা থাকত। যেতে যেতে লোকে গিয়ে পড়ত গিরিখাতের ভেতরে, যেখানে ভেঙে-পড়া শিলাখণ্ডগুলো পাহাড়ি নদীর প্রবল স্রোতে গড়াতে গড়াতে গোল গোল নুড়ির আকার পেত। কখনও বা তারা সাগরতীরে, শৈলসঙ্কুল বেলাভূমিতে উপযুক্ত পাথর খুঁজে বেড়াত।

আদিম মানুষেরা সময় সময় ঐ সমস্ত পাথরের মধ্যে বিশেষ ধরনের কিছু কিছু পাথরের সন্ধান পেত। সেই পাথর পিটিয়ে চ্যাপটা করা যেত, পিটালে ফাটত না, টুকরো টুকরো হয়ে যেত না। দুটো বড় বড় পাথরের মাঝখানে ফেলে অনেকক্ষণ ঘা মারতে মারতে অনেক সময় ছুরির জন্য পাতলা পাত কিংবা কুড়ুলের জন্য খানিকটা স্থূল ধরনের কুঁদো হত। এই হাতিয়ারগুলোকে শান দেয়া যেত।

তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ যে ওগুলো আসলে স্বাভাবিক ধাতুপিণ্ড: তামা, সোনা, কখনও কখনও আবার রূপোও পাওয়া যেত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দর পর সহস্রাব্দ কেটে গেল। ধীরমন্থর গতিতে বদলাতে লাগল আদিম মানুষের জীবনযাত্রা। বিন্দু বিন্দু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে চলল। পৃথিবী যে কত বড় হতে পারে সেই সময় এ নিয়ে কোন মানুষই মাথা ঘামাত না। চারপাশের সবকিছুই বড় বলে মনে হত। নদী, সরোবর—মনে হত বিশাল বিশাল। তার আরও কারণ এই যে আদিম মানুষের তখনও নৌকো ছিল না। তৃণভূমি, বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত–তার পক্ষে পার হওয়া দুঃসাধ্য। লোকে যানবাহন বলতে কিছু জানত না। একে শুধু দু'পায়ের ওপর ভরসা, তাও আবার পথঘাটের বালাই নেই–কত দূরই বা যাওয়া যেতে পারে? ভয়াবহ বনেজঙ্গলে আর তৃণভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যত রাজ্যের রক্তপিপাসু জন্তুজানোয়ার। সরোবরে, সাগর-মহাসাগরে আছে হিংস্র মাছেরা। সকলেই অসতর্ক পথিককে গিলে খাওয়ার তালে আছে। গিলে যদি নাও খায় ভয় তো পাইয়েই দেবে। লোকে তাই চেষ্টা করত

বেশি দূরে না গিয়ে নিজের নিজের এলাকার কাছেপিঠে থাকার। তখন পর্যন্ত দূর যাত্রার কথা কেউ চিন্তাই করত না। আর এই কারণেই আদিম মানুষের কাছে তার আস্তানা আর আশেপাশে চোখে যতটুকু দেখা যেত সেটাই ছিল গোটা পৃথিবী।

মানুষ আদি বাসস্থান ছাড়ার কারণ

বিজ্ঞানীদের মতে, সবচেয়ে আগে মানুষের আবির্ভাব ঘটে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অঞ্চলগুলোতে। ঐ সব এলাকাতেই আদিম মানুষের প্রাচীনতম দেহাবশেষ ও তার স্থূল হাতিয়ার পাওয়া গেছে, কিন্তু আমেরিকা মহাদেশে বা অস্ট্রেলিয়ায় এমন কোন নিদর্শন মেলেনি। তার মানে কি এই নয় যে মানুষ আরও পরে কোন এক সময় সেখানে বাসাবদল করে? বাসাবদল কেন করে? কেন চলে যায় নিজেদের জন্মস্থান ছেড়ে? কীভাবেই বা পার হয় সুবিশাল মহাসাগর?

জানা গেছে যে এ ধরনের বাসাবদলের কারণ অনেক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুধার তাড়না। আদিম শিকারীরা বন্য জন্তুজানোয়ারের পালের পেছন পেছন বাস উঠিয়ে নিয়ে চলে যেত: বন্য জন্তুজানোয়ার যেখানে, তারাও সেখানে যেত। কোন কোন কুলকে বাড়াবাড়ি রকমের জঙ্গী পড়শীদের হাত থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হত। আবার কোন কোন সময় পৃথিবী নিজেও জীবজন্তু ও মানুষের বাসভূমি ত্যাগের কারণ হত।

আমাদের এই গ্রহের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন বেশ কয়েকটি পর্বের সন্ধান পেয়েছেন যখন উষ্ণ জলবায়ুর বদলে এসেছে শৈত্য, তারপর আবার উষ্ণতা। কেন যে এমন ঘটেছিল বলা কঠিন। এটা ঘটে বিশেষ করে তখনই যখন ভূগর্ভের ভেতরে প্রচণ্ড শক্তি জেগে ওঠে। মারাত্মক মারাত্মক ভূমিকম্পে পৃথিবীর মাটি টলমল করে। পৃথিবীর গায়ে ভাঁজ পড়তে থাকে। জেগে ওঠে নতুন নতুন পাহাড়পর্বত, ধূমায়মান আগ্নেয়গিরি, আর পৃথিবী চৌচির হয়ে বেরোতে থাকে যত রকমের গভীর ফাটল—গিরিখাত। জাগ্রত আগ্নেয়গিরিগুলো বায়ুমণ্ডলে এত বেশি পরিমাণ ছাই ছুঁড়ে ফেলতে থাকে যে বাতাস আর স্বচ্ছ রইল না। ঘন ভারী কালো কালো মেঘের দল সূর্যকে বহু কালের জন্য ঢেকে রেখে দেয়। ঠাণ্ডা নেমে আসে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ অবশ্য এমন কথাও বলেন যে সময় সময় সূর্য নিজেই আর তেমন উজ্জ্বল কিরণ দিত না, আমাদের পৃথিবীতে কম তাপ দিত। কারণ যাই হোক না কেন, ঠিক এই ধরনের পর্বগুলোতেই পৃথিবীর উঁচু উঁচু জায়গায় হিমবাহ গড়ে উঠতে লাগল। সাগর-মহাসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ওপরে উঠে গিয়ে তুষার হয়ে ঝড়ে পড়ে শ্যামল উপত্যকাভূমিগুলোকে ঘন তুষারস্তূপে ঢেকে দিল। পাহাড়ের হিমবাহ পুরু আর ভারী হতে থাকে, এদিকে সাগরের জল ক্রমেই কমতে থাকে। সাগরের কোন কোন অগভীর অংশে তলা পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল, পরে সেগুলো শুকিয়ে গিয়ে ডাঙা হল। পৃথিবীর এক অংশ থেকে অন্য অংশের ওপর গড়ে উঠল ডাঙার সেতু। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে কি পৃথিবীতে সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে ভয়ঙ্কর শৈত্যপ্রবাহ চলেছিল মানুষের আবির্ভাবের বহুকাল আগে। তবে মানুষও তার কবল থেকে একেবারে রেহাই পায়নি।

হিমবাহগুলো তাদের নিজেদের ভারে পাহাড়ের চুড়ো থেকে সমভূমিতে গড়িয়ে নামতে থাকে। ঠাণ্ডার তাড়নায় তৃণভোজী পশুপাল পালাতে থাকে, তাদের পেছন পেছন হিংস্র জন্তুজানোয়ার। সেই সঙ্গে মানুষও।

ডাঙার সেতু বয়ে দলে দলে জীবজন্তু এবং সেই সঙ্গে আদিম শিকারীরাও এশিয়া থেকে আমেরিকা মহাদেশে চলে আসতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ-চীন সাগরের খালি তলদেশ আর সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবার কোন বাধাই ছিল না।

হাজার হাজার বছর ধরে চলল হিমযুগ। কিন্তু হাজার হাজার বছরও তো আর অনন্তকাল নয়। ধীরে ধীরে ভারী মেঘ সরে যেতে লাগল সূর্য ফের উজ্জ্বল কিরণ দিতে শুরু করল। ফলে বরফ গলল, হিমবাহ সরে যেতে বাধ্য হল। বরফমুক্ত জমিগুলোতে আবার গজিয়ে উঠল রসাল শ্যামল ঘাস, মাথা তুলে দাঁড়াল কচি গাছপালার বন। ঘন তৃণভূমিতে আগমন ঘটল ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, বড় বড় শিঙওয়ালা হরিণ, ঘোড়া কস্তুরীগাই—এই রকম বিশাল বিশাল জন্তুর। তাদের অনুসরণ করে শিকারীরাও ফের জায়গা বদল করল।

এদিকে সূর্য আরও প্রখর হয়ে উঠল, দাবদাহ ছড়াতে লাগল। উত্তাল

নদনদী সাগরে গিয়ে পড়তে লাগল। জল উঠে বন্যায় ভাসিয়ে দিল ভাঙার সেতু। যে সমস্ত মানুষ পেছনে পড়ে ছিল তারা চিরকালের জন্য অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

এই ধরনের হিমযুগ আর উষ্ণতার যুগ একাধিকবার আসে। প্রতিবারই ঠাণ্ডায় ও ক্ষুধার তাড়নায়, উষ্ণতার আশায় জীবজন্তু ও মানুষেরা উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণে ও দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তরে সরে যায়। সর্বত্রই গতি আর গতি—পশুপাখি, মানুষ সকলেই বাসাবদল করে চলছে। অনেকেই এই স্থানান্তরের ধকল সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। তবে অনেকে বেঁচেও থাকে। আর প্রতিবারই এরকম বাসাবদলের ফলে মানুষের জীবনে কিছু না কিছু নতুনত্ব আসে।

মানুষ কীভাবে একসঙ্গে বসবাস করতে শিখল

শিকার একটা ভালো জীবিকা, তবে তার ওপর খুব একটা নির্ভর করা যায় না। আজ হয়তো একপাল হরিণ ধরা পড়ল, পরদিন—কিছুই না। অথচ খেতে তো হয় রোজই। তাহলে শিকারীর শ্রম কীভাবে সহজসাধ্য করা যায়?

কোন এক সময় কেউ কুকুর পোষ মানাল। হয়তো সে কুকুর প্রথমে অসুস্থ বা আহত ছিল, মানুষ করুণাপরবশ হয়ে তাকে সুস্থ করে তুলল, পেট পুরে তাকে খাওয়াল। কুকুর নিয়ে শিকার করা অনেক সুবিধার হল। কুকুর শিকার খুঁজে বার করে। মানুষ পশু শিকার করে। মাংস ও ছাল নিজের জন্য রাখে, হাড় আর নাড়িভুঁড়ি দেয় তার চারপেয়ে সাহায্যকারীকে। কতই বা দরকার তার?

মানুষ অল্প অল্প করে অন্যান্য বন্য জন্তুকেও পোষ মানাতে লাগল। কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না, খুব তাড়াতাড়িও হল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ পেল গৃহপালিত পশু।

কন্দমূল ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজও দেখতে দেখতে নারী ও শিশুদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বসতিতে খাওয়ার লোকজনের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। সকলের জন্য যোগাড় করা কি সম্ভব? উ: নারীরা শেষকালে লক্ষ্য করল যে খাদ্যশস্যের বীজ যদি নদীর ধারের ভিজে পলিমাটিতে বোনা যায়, তাহলে বুনো মাঠের তুলনায় গাছ আরও বড় ও

মজবুত হয়। ফসলের শীষ আরও বড় আকারের হয়, দানা আরও ভারী হয়। তাছাড়া সারা দিন ধরে একটা একটা করে শীষ খুঁজে খুঁজে দানা বার করার হাঙ্গামাও পোয়াতে হয় না। যেখানে বোনা হল সেখানেই ফসল ফলল। লোকে তাই বিশেষ উদ্দেশ্যে ফসলের বীজ পাঁকে পুঁততে লাগল। এতে প্রথম লাভ হল এই যে ফসল আরও ভালো ফলে, দ্বিতীয়ত পাখিরা খুঁটে খেয়ে ফেলতে পারে না। এই ভাবে প্রথম খেতের আবির্ভাব। কৃষিকাজের সূত্রপাত।

পশুপালন ও কৃষিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বেশ সচ্ছল হয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে গৃহস্থালি জটিলও হয়ে পড়ল: একে শিকার, তার ওপর পশুপালন, ওদিকে আবার জমি চাষ করতে হয়, হাঁড়িকুঁড়ি বানাতে হয়, হাতিয়ারও তৈরি করতে হয়। একটা ছোট-খাটো পরিবারের পক্ষে সব দিক সামলানো মুশকিল। মানুষ ভাবতে শুরু করল, আচ্ছা, প্রতিবেশী কুলের সঙ্গে মিললে কেমন হয়?

আলাদা আলাদা কুল বা পরিবার এইভাবে একসঙ্গে মিলে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে শুরু করল। বড় বড় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করা অনেক নিরাপদ, আবার খানিকটা কঠিনও বটে। এ ধরনের গৃহস্থালিতে কাজের বন্টন কীভাবে হবে?–কে কী কাজ করবে? শিকার আর লাভের বখরা কী ভাবে হবে?—কে বেশি পাবে, কেই বা কম?

ঠিক হল উঃ সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকদের নিয়ে গোষ্ঠীসভা তৈরি করা হবে। শিকার আর যুদ্ধের সময়ও পরিবারগুলো যূথবদ্ধ হত, সাময়িক বন্ধনে আবদ্ধ হত। কিন্তু কৃষিকর্মে দরকার হত স্থায়ী সহযোগিতার। নতুন খেতের জন্য জলাভূমি শুকোতে হলে, খাল কাটতে হলে অথবা বন্যা রোধের জন্য বাঁধ তৈরি করতে হলে সমবেত প্রয়াস অপরিহার্য।

ইতিহাসবিদরা বলেন যে উন্নতমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর প্রথম আবির্ভাব ঘটে নদী অববাহিকায়। আগে কোথায়, বলা কঠিন। সম্ভবত মেসোপোটামিয়ার দক্ষিণ অংশে, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটাস নদীবিধৌত নিম্নপ্রান্তরে। আবার এমনও হতে পারে যে ভারতের সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় কিংবা জলপূর্ণ নীল নদের অববাহিকায়। অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে মানুষ আগে চাষবাস করতে, বীজ বুনতে, জমি জরিপ করতে এবং খাল কেটে জমিতে জলসেচের কাজ করতে শেখে। এই

সমস্ত জায়গায়ই প্রথম খনি থেকে ধাতু তুলে গলানো হয়, উঁচু উঁচু ইমারত বানানো হয়।

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ সমান অনুপাতে ভাগ করা নেই। যেমন ধর না কেন, কোন জনবসতিতে হয়তো অনেক খনি আছে, কিন্তু লবণ নেই। আবার অন্য জায়গায় তার উল্টোটা। কোন পল্লীতে বা শহরে হয়তো অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় তৈরি হয়, আবার অন্যত্র হয় বাসনপত্র। তখন লোকে যার কাছে যে জিনিস উদ্বৃত্ত আছে তাই দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিনিময় শুরু করে দিল। পরস্পরের কাছে পণ্যদ্রব্য আনতে শুরু করল। বণিকদের আবির্ভাব ঘটল। জন্ম হল বাণিজ্যের। দেখা গেল বণিক জাতটা মাথায় বেশ বুদ্ধি রাখে। যারা জানা রাস্তাঘাট ছেড়ে অচেনা পথে যাত্রা করার ঝুঁকি নিতে পারে তারা যে প্রচুর লাভ করে ফিরে আসে এটা বুঝতে তাদের বাকি রইল না। এই ভাবে শুরু হল প্রথম বাণিজ্যযাত্রা। তখনই মানুষকে জানতে হল কোথায় কী রকম লোকজনের বাস, কী সম্পদ তাদের আছে, কী তাদের অভাব, তাদের জমিই বা কেমন।

পৃথিবীর প্রাচীন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি ছিল ভূমধ্যসাগরীয় তীরভূমি। স্মরণাতীত কাল থেকে বহু জাতের অসংখ্য মানুষ এখানে এসে ভিড় করে।

পৃথিবীর অত্যুন্নত প্রাচীন সভ্যতাগুলোর একটির—গ্রীক সংস্কৃতির উদ্ভব এখানেই। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রেখে যান। প্রথম মানচিত্র রচয়িতার মধ্যে তাঁরা ছিলেন অন্যতম। ঐ সমস্ত মানচিত্রে তাঁরা পৃথিবীর যে ছবি আঁকেন তাতে পৃথিবীটা দেখতে ছিল একটা বড় দ্বীপের মতো, তার মাঝখানে সমুদ্র। দ্বীপের চারপাশে বয়ে চলেছে আদি অন্তহীন মহাসাগরের উত্তাল প্রবাহ।

প্রাচীন গ্রীকের এরকম পৃথিবী-দ্বীপের নাম দিয়েছিরেন 'ওইকুমেনাস', যার অর্থ হল 'জন অধ্যুষিত ভূমি'।

এশিয়া, ভারত, চীন ও ব্রিটেনের কোন কোন অঞ্চলও জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় 'জনভূমির' সঙ্গে সেগুলোর ব্যবধান ছিল হাজার হাজার মাইলের পথ, পাহাড়-পর্বত আর মরুভূমি। কিছু কিছু দুঃসাহসী লোকজন কারাভান সাজিয়ে অথবা নড়বড়ে জাহাজে চেপে পণ্যদ্রব্য নিয়ে

দূর দূর দেশে যাত্রা করতে মনস্থ করল। যারা ওখানে থাকার পর ফিরে আসতে পারত তারা সাগরপারের আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস ছাড়াও সঙ্গে করে আনত আজব দেশ আর বিস্ময়কর লোকজন সম্পর্কে অঢেল কাহিনী। ভ্রমণকারীরা সোনা আর মণিমাণিক্যের দেশ, সমৃদ্ধশালী ভারতের কথা বলেন, অসংখ্য ঘোড়ার পাল আর মানুষের মাথার চেয়ে উঁচু ঘাসে ঢাকা সীমাহীন স্তেপ তৃণভূমির শকদের বর্ণনা দেন। আর মহার্ঘ ধাতু থেকে কী অপূর্ব অস্ত্রই না বানাতে জানত মধ্য এশিয়ার হুনরীরা! ব্রোঞ্জ গলানোর জন্য যে টিন পাথর এত অপরিহার্য তা কী প্রচুর পরিমাণেই না পাওয়া যায় দূর ব্রিটেনে!

সেই আমলের প্রতিটি ভ্রমণই ছিল এক একটি ঘটনা বিশেষ। দুঃসাহসী ভূপর্যটকদের নাম ইতিহাসে থেকে যায়। তাঁদের সম্পর্কে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, তাঁদের নিয়ে গান বাঁধা হয়। তাঁদের পর্যটনের খুঁটিনাটি বিবরণ বহুকাল ধরে লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। সাগরপারের দূর দূর দেশে অজানা লোকজনের কাছে যাত্রার কাহিনী শোনার চেয়ে আর কিছুতেই মানুষ বেশি আগ্রহ প্রকাশ করত না। হয়তো ঠিক এই সময়ই শ্রোতাদের মনে কিংবা কথকদের নিজেদের মনেই বুঝিবা প্রশ্ন জাগে: 'আমাদের এই পৃথিবীটা কেমন? কিসের মতো? তার শেষই বা কোথায়? কী আছে তার শেষে?'

পৃথিবী কি চেপ্‌টা? জ্ঞানসাধক আর মনীষীদের পীঠস্থান। ফিনিশীয়দের ধারণা পৃথিবী গোল—এই ধারণা প্রথম কাদের?

পৃথিবী কি চেপ্‌টা?

লোকে যত বেশি পৃথিবী পর্যটন করতে লাগল ততই তাদের মাথায় এই চিন্তা এসে ভর করল: 'পৃথিবীটা দেখতে কেমন, কী রকম তার আকার?' উ: বিজ্ঞানীদের মতে, এই নিয়ে সর্বপ্রথম মাথা ঘামান তিয়ান-সিয়া দেশের মহাজ্ঞানীরা। তিয়ান-সিয়া অর্থ হল 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্য'। তোমরা বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করতে পেরেছ যে এটা চীনদেশ—পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজ্যগুলোর একটি। চীনের অবিসংবাদিত সর্বোচ্চ শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট। সময় সময় নিজেদের রাজ্যের সঠিক সীমানা বার করার কথা একেকজন নতুন নতুন সম্রাটের মাথায় আসে। এই উদ্দেশ্যে রাজধানী থেকে রাজপুরুষেরা নানা দিকে চলে যেতেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেতেন দিব্যি আরামের চক্রযানে। এই ধরনের প্রত্যেকটি শকটের মধ্যে থাকত একটা রহস্যজনক যন্ত্র, যার কাঁটা সবসময় নির্দেশ করত একই দিক। এই যন্ত্র সঙ্গে থাকলে পথ ভুল করার কোন সম্ভাবনা নেই। চীনেরা এর নাম দিয়েছিল 'দক্ষিণ দিগদর্শন'।

প্রাচীন রহস্যজনক যন্ত্রটি আমাদের কালেও টিকে আছে। আজ সকলে এটাকে বলে থাকে কম্পাস, সকলেই জানে এর রহস্য। এর মধ্যে একটুকু জটিলতা নেই–সাধারণ একটা ছোট্ট বাক্স, তার মধ্যে পিনের ওপর বসানো একটা চৌম্বক কাঁটা। কাঁটার নীল দিকটা দেখায় দক্ষিণ, লালটা–উত্তর।

এই রাজপুরুষ মান্দারিনদের নিয়ে শকট সুদীর্ঘকাল ধরে তৃণভূমি আর মরুভূমির ওপর দিয়ে চলত। কিন্তু সম্রাটের দূতেরা যে দিকেই যান সর্বত্রই দেখতে পান সবসময় সন্ধ্যাকাশে তারাগুলো পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে। 'এমনটি হয় কেন?' তাঁরা ভাবলেন। নিজেদের এই প্রশ্নের উত্তর তাঁরা কোনমতেই খুঁজে পেলেন না।

আরেকদল রাজপুরুষ চলে যান পার্বত্যপ্রদেশে। সরু পাহাড়ী পথে গাড়ি চেপে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ভৃত্যরা তাঁদের বয়ে নিয়ে যেত

ডুলিতে। রাজপুরুষেরা গুমোট ডুলির ভেতরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে অবাক হয়ে ভাবতেন: 'আচ্ছা, এই স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের একটা অংশ কেন এমন?–এত উঁচু যে একেবারে আকাশের দিকে উঠে গেছে, অথচ অন্য অংশটা এত নীচু?' কিন্তু এঁরাও নিজেদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন না।

অন্য এক দল রাজপুরুষ যাত্রা করলেন জলপথে—নৌকোয় চড়ে। ছোট বড় নানা নদনদীর ওপর দিয়ে তাঁরা চলেন। খালের ওপর দিয়েও। ভৃত্যরা তাঁদের মাথার ওপর ছত্র ধরে থাকে, মাছি তাড়ায়। রাজপুরুষেরা চিন্তা করতে থাকেন: 'আচ্ছা, এমন হয় কেন যে সম্রাটের রাজ্যের সমস্ত নদনদী বয়ে চলেছে একই দিকে–পশ্চিম থেকে পুবে?' কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তেও তাঁরা এর ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না।

সভাপণ্ডিতরাও এই নিয়ে কম মাথা ঘামালেন না। কিন্তু যেহেতু সম্রাট দাবি করতেন যে তাঁরা যেন অবশ্যই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন সেই হেতু তাঁরা শেষ পর্যন্ত একটা উত্তর বের করলেন মাথা খাটিয়ে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বললেন: 'আসুন, এই রকম একটা বোঝাপড়ায় আসা যাক—ধরা যাক পৃথিবী একটা সরা-পিঠের মতো চেপ্‌টা, তার ধারগুলো চারকোণা করে কাটা। এই সরা-পিঠে পৃথিবীর প্রতিটি ধারে আকাশের সঙ্গে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি করে উঁচু উঁচু থাম। একটি থাম উত্তরে, আরেকটি পুবে, একটি দক্ষিণে, অন্যটি পশ্চিমে। ভূমণ্ডলের যতগুলো দিক ঠিক ততগুলোই থাম।'

ব্যাখ্যাটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হল, সকলে এতে খুশিও হল। চীনেরা তাদের দেশ নিয়ে পাঁচশো বই লিখে ফেলল। সবগুলো প্রদেশের, এমনকি তার ওধারেও যা ছিল সেগুলোর বর্ণনা দিয়ে পাঁচশোটি মোটা মোটা কাগজের পাকানো পুথি।

কিন্তু এক সময় বড় রকমের যুদ্ধের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন এমন এক সম্রাট যিনি ড্রাগনের মতো খল, মূর্খও, আর সেই কারণে আরও খল প্রকৃতির। পুথি পড়ে তিনি জানতে পারলেন যে স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরেও লোকজন বাস করে, আর সবচেয়ে আপত্তিকর কথা এই যে তারা চীনাদের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। সম্রাট তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন যে-সমস্ত পুথিতে ভিনদেশের বর্ণনা আছে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে দিয়ে চীনেদের সবাইকে যেন এটাই ভালো করে

http://allbengalibooks.blogspot.com

বুঝিয়ে দেয়া হয় যে তাদের দেশের সীমানার বাইরে আকর্ষণীয় জগত বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, খল সম্রাট চীনের নাম পর্যন্ত বদল করে রাখলেন 'জুন্-হুয়া-গো,' যার অর্থ 'বিকশিত মধ্য সাম্রাজ্য।' তখন থেকে চীনেরা তাদের দেশকে ঐ নামেই উল্লেখ করত, যদিও তার বিকাশ ও সৌরভ অতটা মুগ্ধ হওয়ার মতো ছিল না।

রাজপুরুষেরা যাঁকে 'দেবনন্দন' আখ্যা দিয়েছিলেন সেই সম্রাটের প্রজারা যাতে দেশের সীমানার বাইরে নাক গলানোর কথা ভাবতেও না পারে সেদিকে তাঁরা কড়া নজর রাখলেন। তাই তাঁরা আরও একটি নাম দিলেন চীনের–'সি হাই', অর্থাৎ 'চার সাগর'। রাজপুরুষেরা এটাই বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে চীনই হল পৃথিবী। এর বাইরে আর কিছুই নেই। এর চারদিক ঘিরে আছে উত্তাল সমুদ্র। সেই সব সমুদ্রে কিলবিল করছে বিশাল বিশাল মাছ আর ভয়ঙ্কর সমস্ত ড্রাগন। অনেকেই একথা বিশ্বাস করে ঘরে বসে থাকত।

অনেকে বিশ্বাস করত বটে, কিন্তু সবাই নয়। দূর দূর দেশে প্রাচীনকালের চীনেদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও বিবরণ আজও সংরক্ষিত আছে।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা মধ্য এশিয়ার অপরিচিত দেশেও ভ্রমণ করেন, সেখানেও সংস্কৃতিবান জাতিরা বাস করে দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যান। তাঁরা দেখতে পান সেখানেও লোকে জমি চাষ করছে, নানা রকম হাতিয়ার, বাসন, অলঙ্কার তৈরি করছে। চীনেরা তাদের নিজেদের পণ্যদ্রব্য পশ্চিমের দূর দূর দেশে নিয়ে বিক্রি করছে। কিন্তু বিক্রি করার মতো জিনিসপত্র এখানকার অধিবাসীদের কাছেও আছে। তাদের তৈরি অনেক পণ্যদ্রব্যই চীনা পণ্যদ্রব্যের তুলনায় কোন অংশে খারাপ নয়।

উ: আর যারা পাহাড়পর্বত ডিঙিয়ে দক্ষিণে এসে পড়ল তারা দেখতে পেল অলোকসামান্য জ্ঞানসাধক ও দার্শনিকদের বাসভূমি, এক আশ্চর্য দেশ—ভারতবর্ষ।

http://allbengalibooks.blogspot.com

জ্ঞানসাধক আর মনীষীদের পীঠস্থান

প্রাচীন ভারত এই আখ্যা অকারণে পায়নি। সেই সুপ্রাচীন কালে যখন তার চারপাশের দেশগুলোতে সবে সভ্যতার সূত্রপাত হতে চলেছে, তখনই এখানে, সুনীল-শ্যামল ভারত মহাসাগরের বুকে প্রসারিত জিহ্বা আকৃতির এই বিশাল উপমহাদেশে জ্ঞানী লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। ভারতবর্ষ অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। প্রত্যেক রাজার রাজসভায় সভাপণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীদের স্থান ছিল। সকলেই তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা করত।

এঁদের মধ্যে গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদ ও ভিষকরা থাকতেন, আর থাকতেন স্রেফ যারা জ্ঞানের উপাসক, শাস্ত্রজ্ঞ—দার্শনিকরা, যাঁরা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বাদির আলোচনা করতেন। তাঁদের বলা হত 'মহাজ্ঞানী'।

এঁদের কল্পনায় আমাদের পৃথিবীটা দেখতে কেমন ছিল?

উ: দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ ছিল। তবে তাঁদের অধিকাংশই এই মত পোষণ করতেন যে পৃথিবী চেপ্‌টা। চীনাদের 'সরা-পিঠের' মতো অতটা চেপ্‌টা অবশ্য নয়, অনেকটা বিশাল আকারের এক চেপ্‌টা থালার মতো। থালার ঠিক মাঝখানে আছে মেরুপর্বত। পর্বতের চারপাশে ঘুরছে চন্দ্র, সূর্য আর তারা। এই পর্যন্ত, কিন্তু তার পরই তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল মতভেদ।

একদল বললেন গোটা স্থলভাগ চারটি মহাদ্বীপে বিভক্ত, আর সেগুলোকে মেরুপর্বত ও পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মহাসাগর। প্রতিটি মহাদ্বীপের নাম হয়েছে সেখানকার উপকূলভাগের একেকটি বিশাল বিশাল বৃক্ষের নামে। তবে মনুষ্যজাতির বাস একমাত্র দক্ষিণের এই মহাদ্বীপে, জম্বুফলবৃক্ষের নামে যার নাম হয়েছে জম্বুদ্বীপ।

আরেকদল কিন্তু এটা মেনে নিলেন না। তাঁদের মতে, জম্বুদ্বীপ মেরুপর্বতের উঁচু চূড়ার চারপাশে একটা বলয় বা মণ্ডলের মতো। লবণের সাগর এই মহাদ্বীপকে পরের মহাদ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সেটাও বলয়াকার। তবে তার বহিরূপকূল বিধৌত করছে যে সাগর তার জল লবণের নয়, ইক্ষুরসের। মহাজ্ঞানীরা তাঁদের পৃথিবীর এই রূপকল্পনায় সাতটি মহাদ্বীপ বলয়ের উল্লেখ করেছেন। সাতটির প্রতিটিই

http://allbengalibooks.blogspot.com

বিভিন্ন উপাদানে তৈরি সাগর দিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই ভাবে ইক্ষুসাগরের পর আছে সুরাসাগর, তারপর সর্পিঃ (ঘৃত), দধি, দুগ্ধ এবং অবশেষে জল। এইবার? পৃথিবীর এহেন জমকাল চিত্রকল্পনার বিরুদ্ধে কারই বা কী বলার সাধ্য আছে?

কিন্তু তা সত্ত্বেও মতপার্থক্য দেখা দিল। কেউ কেউ জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে পৃথিবী একটা প্রস্ফুটিত কমলের মতো। সবচেয়ে বড় বড় চারটি দল—চার মহাদ্বীপ। গর্ভকেশর আর পুংকেশর—ভারতের প্রধান দুই নদনদী সিন্ধু ও গঙ্গার উপত্যকার চারপাশে পাহাড়পর্বত। কূলকিনারাহীন সাগরে এই কমলের বৃদ্ধি, সাগরের তলদেশে তার মৃণাল গাঁথা।

এই চিত্রেও কিন্তু সকলে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। যাঁরা মানতে পারলেন না তাঁরা পৃথিবীকে কল্পনা করলেন আরেক রূপে। তাঁদের কল্পনায় বিশাল দুগ্ধসাগরে ভাসছে এক দৈত্যাকার কূর্ম। কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের খোলের চেয়ে শক্ত জগতে আর কী হতে পারে? কচ্ছপের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে চারটি হস্তী। জগতে তাদের চেয়ে বলবান আর কে? হাতিরা শুঁড় উঁচিয়ে পৃথিবীর চারদিকে মুখ করে আছে। আর তাদের মহাশক্তিমান পিঠের ওপর ধারণ করে রয়েছে পৃথিবী—চেপ্‌টা, গোল তার আকার।

আশ্চর্য সমস্ত রূপ কল্পনা করেছিলেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞানসাধক আর মনীষীরা!

http://allbengalibooks.blogspot.com

ফিনিশীয়দের ধারণা

স্বকীয়তার অধিকারী ছিল ফিনিশীয় জাতি। তাদের বাসভূমিও ছিল এক অসাধারণ দেশ। কেননা সত্যি কথা বলতে গেলে কি ফিনিশিআ নামে কোন ভূখণ্ড কস্মিনকালে ছিল না। ভূমধ্যসাগর আর উঁচু পর্বতশ্রেণীর মধ্যে চাপা পূর্ব উপকূলের চিলতে সমতলভূমিকে আসলে প্রাচীন গ্রীকেরা এই নাম দিয়েছিল। আজ সেখানে লেবানন। ফিনিশীয় নগরগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান বেশ ভালো ছিল। বাণিজ্যের পসরা নিয়ে অসংখ্য কারাভান মেসোপোটামিয়া ও নীলনদের অববাহিকায় যেত, ভূমধ্যসাগরের সুনীল তরঙ্গবিধৌত সমস্ত দেশে ফিনিশীয়দের জাহাজ যাত্রা করত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপকূলভাগগুলোতে ফিনিশীয় উপনিবেশ তথা বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরপল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ঐ সমস্ত কেন্দ্রের কতকগুলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পরিণত হল স্বাধীন, শক্তিশালী প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রে। এই প্রসঙ্গে কার্থেজের নাম করা যেতে পারে।

ফিনিশীয় নগরগুলোতে পশম রঙ করার জন্য এক ধরনের আশ্চর্য ঘন লাল রঞ্জক বানানো হত। সেই পশম দিয়ে সবচেয়ে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পোশাক বোনা হত। এছাড়াও এখানে ধাতু গালাই ও ঢালাই করা হত, ধাতু মুদ্রাঙ্কনের কাজ হত, কাচের তৈজসপত্র ও অলঙ্কার তৈরি হত। আর কী সব জাহাজই না ফিনিশীয়রা বানাতে পারত! তাদের চেয়ে ভালো জাহাজ সেকালে আর কেউ গড়তে পারত না। জাহাজ তৈরির কারিগররা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ কেটে জাহাজের চওড়া খোল তৈরি করত। তার ওপর তারা উপরের আরও সমস্ত কাঠামো বানিয়ে মোটা মোটা তক্তা দিয়ে ঢেকে দিত, যাতে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঢেউ দাঁড়িদের গায়ে আছড়ে না পড়ে। দাঁড় চালাতে যাতে সুবিধা হয় তার জন্য উঁচু উঁচু মাস্তুলের ওপরে পাল খাটানো হত। এ ধরনের জাহাজে তিরিশ জন পর্যন্ত মাঝিমাল্লা থাকত। দুঃসাহসী নাবিকরা কি দেব কি দানব–কাউকেই পরোয়া করত না, বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়ঝঞ্ঝার ভয় তারা করত না। ভূমধ্যসাগরের সমস্ত পথ ফিনিশীয় কাণ্ডারীদের নখদর্পণে ছিল।

ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়েও তারা যাত্রা করে। খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মিশরের ফারাও দ্বিতীয় নেহো নৌবহর সাজিয়ে ফিনিশীয় অভিযাত্রীদের

http://allbengalibooks.blogspot.com

আফ্রিকার উপকূলভাগ ধরে চলার আজ্ঞা দেন। অভিযাত্রীরা গোটা মহাদেশ ঘুরে অন্য পাশ থেকে দেশে ফিরে আসে।

দুই কার্থেজীয় অভিযানকারী হ্যানো ও হ্যামিলকারের আটলান্টিক মহাসাগর যাত্রার বিবরণ আজও আমাদের জানা আছে। সমুদ্রযাত্রী নাবিকের চেয়ে সেনানায়ক, রূপেই বেশি খ্যাতিমান হ্যানো বিভিন্ন সামরিক অভিযানকালে তাঁর নৌবহর নিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দীর্ঘ পথ যাত্রা করেন আর হ্যামিলকার ইউরোপের উপকূলভাগ ধরে দূরে, উত্তরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছান।

দূর সমুদ্রযাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে নাবিকেরা সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে কখন দূরে স্বদেশের উপকূল দেখা যাবে। ফিনিশীয়রাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু এই রকম অপেক্ষার মুহূর্তে তারা কী দেখতে পায় সেটাই লক্ষ্য করার মতো: সমুদ্রের গভীরতা থেকে সবসময় দূর থেকে প্রথমে কেন যেন চোখে পড়ে স্বদেশের পাহাড়পর্বতের সর্বোচ্চ শীর্ষগুলো। জাহাজ আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে এলে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়গুলো। তারও পরে তীরভূমির একেবারে কাছাকাছি আসা মাত্র শহরের ঘরবাড়িগুলোও যেন শুশুকের মতো ভূস করে সাগরগর্ভ থেকে জেগে উঠল।

'কেন এমন হয়?' উ: নাবিকেরা অবাক হয়ে ভাবে। 'পৃথিবী যদি চেপ্‌টাই হবে তাহলে তো তার ওপরকার সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ার কথা? যারা বলে পৃথিবী একটা সরা-পিঠের মতো তারা ভুল করছেন না তো? অর্ধেক আপেলের সঙ্গেই এর বেশি মিল দেখা যাচ্ছে নাকি? পৃথিবীর পিঠকে যদি বাঁকা বলে কল্পনা করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে সমুদ্রের ভেতর থেকে কেন আগে জেগে ওঠে পাহাড়ের মাথা, কেনই বা জাহাজের ডেক থেকে যতটা দেখা যায় মাস্তুলের মাথা থেকে তার চেয়েও বেশি দূর দেখা যায়।'

ফিনিশীয় সমুদ্র-অভিযাত্রীরা তাই এই সিদ্ধান্তে এলো যে পৃথিবীর পিঠটা বাঁকা—জলসুদ্ধ থালার ওপর রাখা অর্ধেক আপেল বা কমলালেবুর মতো দেখতে। জল হল সাগর, আর থালার কানার ওপর ঠেক দিয়ে আছে নীলরঙের বিশাল এক ওল্টানো গামলা—গগন।

পৃথিবী অদ্ভুত রূপকল্পনা বটে, তাই না?

http://allbengalibooks.blogspot.com

পৃথিবী গোল—এই ধারণা প্রথম কাদের?

আজ এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া বোধহয় কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সেই সুপ্রাচীন আমলে প্রতিটি উন্নত রাষ্ট্রে তাদের নিজস্ব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা ছিলেন, আর তাঁদের অনেকের মাথায়ই নানা কারণে এই চিন্তা খেলে। যেমন প্রাচীন গ্রীসের মনীষী পিথাগোরাস মনে করতেন যে গোলক হল সর্বোত্তম জ্যামিতিক আকার। আর পৃথিবী যদি মহাবিশ্বের কেন্দ্র হয়, তাহলে এছাড়া অন্য কি আকৃতিই বা তার হতে পারে? অনেক পণ্ডিতই পিথাগোরাসের সঙ্গে একমত হলেন। কিন্তু এটা কীভাবে প্রমাণ করা যায়? কীভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে, বর্ণনা দিয়ে এটা বোঝানো যায় যাতে কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে?

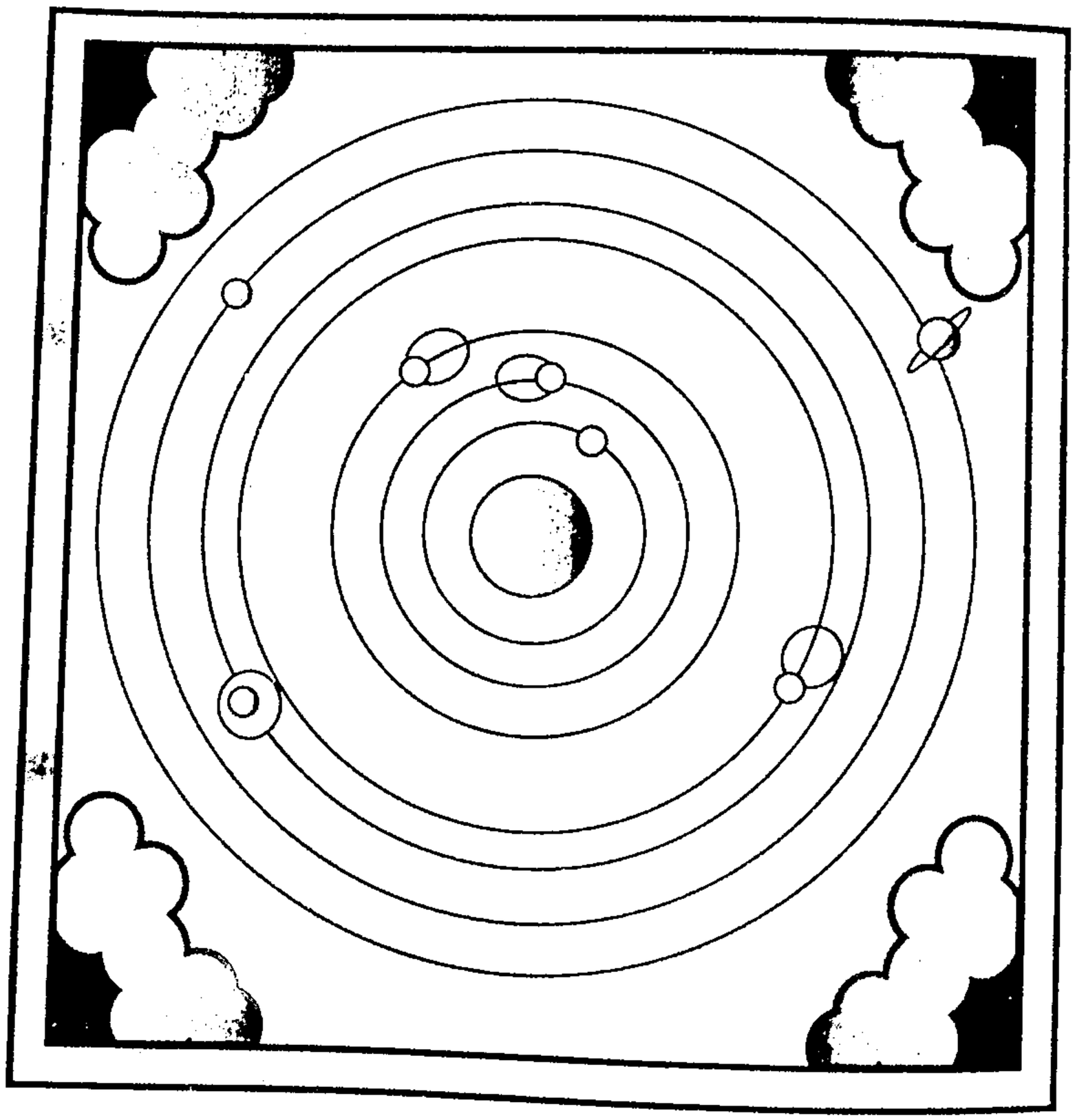

এ কাজে সফল হলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল পরম পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় তাঁর অধিকার ছিল। বিখ্যাত সেনানায়ক মহাবীর আলেকজান্ডারের গুরু ছিলেন তিনি। সেকালে এথেন্সে যে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ধারার উদ্ভব ঘটে তিনিই

http://allbengalibooks.blogspot.com

তার প্রতিষ্ঠাতা। অ্যারিস্টটলের যশ এতদূর ছড়িয়ে পড়ে যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বহু শিষ্য জুটে যায়। এমন কি আলেকজান্ডার মহা সেনানায়ক হওয়ার পরও তাঁর গুরুকে দেখে কখনও বিস্মৃত হননি। বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি গুরুকে পত্র লিখতেন, ভিনদেশ থেকে নানা দুর্মূল্য বস্তুও তাঁকে পাঠাতেন।

খাঁটি পণ্ডিতেরা সচরাচর যেমন হয়ে থাকেন অ্যারিস্টটলেরও তেমনি জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। জ্ঞান এমনই সম্পদ যে তা সঞ্চয় করার মধ্যে কারও লজ্জার কোন কারণ নেই!

সেকালে মানুষ যে সমস্ত জিনিস পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোর মধ্যে চন্দ্রগ্রহণের রহস্যও ছিল অমীমাংসিত। চন্দ্রগ্রহণ কী থেকে হয়? কেউই ব্যাখ্যা করতে পারত না। একদলের ধারণা, দৃষ্ট দানবেরা চাঁদের রূপোলি আলো থেকে সকলকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে চাঁদকে লুকিয়ে ফেলে। আরেক দলের দৃঢ়বিশ্বাস, চন্দ্রগ্রহণ অমঙ্গলের পূর্বাভাস সূচনা করে—এর ফল হয়তো বা যুদ্ধবিগ্রহ, আর সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারী। এমনকি এরকম লোকজনও ছিল যারা চতুর্দিকে রাষ্ট্র করে দিত যে গ্রহণের ফলে বায়ু বিষাক্ত হয়ে যায়, লোকে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা পড়ে। সরলবিশ্বাসী লোকেরা এই প্রতারণার পাল্লায় পড়ে ভূগর্ভ-কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকত। তারা মাটির প্রলেপ দিয়ে ফাঁকফোকর বন্ধ করত, জানলায় কোন ফাঁক রাখত না।

অ্যারিস্টটল ভীরু ছিলেন না। তিনি একাধিকবার গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, তাঁর কিছুই ঘটেনি। পর্যবেক্ষণের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে চাঁদের একপাশের কালো বিন্দুটা আর কিছুই নয়—পৃথিবী যখন চাঁদ আর সূর্যের মাঝখানে আসে তখন পৃথিবী চাঁদের ওপর যে ছায়া ফেলে, তাই। কিন্তু এই ছায়া সবসময়ই গোলাকার হয় কেন?

অ্যারিস্টটল একটা চেপ্‌টা সরা-পিঠে সূর্যের আলোয় বার করে আনলেন। সরা-পিঠেটা একভাবে রাখলে ছায়া হয় গোলাকার, অন্যভাবে রাখলে হয় একটা ডালের মতো সরু। তার মানে, পৃথিবী চেপ্‌টা সরা-পিঠের আকারের হতে পারে না।

আধখানা কমলালেবু নিয়ে সেটাও তিনি সূর্যের আলোর সামনে ধরলেন। সূর্যের কিরণ যখন কাটা গোল অংশে বা গোলাকার পিঠটার

http://allbengalibooks.blogspot.com

ওপর পড়ে একমাত্র তখনই আধখানা কমলালেবু ছায়া হয় বৃত্তাকার। কমলালেবুর আধখানাকে সূর্যের দিক কাত করে ঘোরানোমাত্রই কিন্তু ছায়া অর্ধবৃত্ত আকার ধারণ করে।

একমাত্র গোটা আপেল বা গোটা কমলালেবুর ছায়া সর্বদাই বৃত্তাকার হবে, তা সে কমলালেবু বা আপেলকে যতই এদিক-ওদিক ঘোরাও না কেন।

'তাহলে আমাদের পৃথিবীর আকারও নিশ্চয়ই গোলকের মতো!' এই বলে অ্যারিস্টটল তাঁর শিষ্যদের দেখালেন কী ভাবে তিনি এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। শিষ্যরা চোখ বড় বড় করে তাদের গুরুর দিকে তাকাল, সকলের তাক লেগে গেল তাঁর পাণ্ডিত্যে। তবে দুর্বোধ্য রয়ে গেল একটা জিনিস–ভূগোলকের বিপরীত অংশে, নীচেকার অপরার্ধে তাহলে লোকে বাস করে কী ভাবে? মাথা নীচের দিকে করে তারা চলাফেরা করে কী ভাবে আর পড়েই বা না কেন?

এই প্রশ্নের কোন প্রত্যয়জনক উত্তর কিন্তু স্বয়ং অ্যারিস্টটলও দিতে পারলেন না। তখনও তো আর কারও জানা ছিল না যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর পিঠে কেবল লোকজন, পাহাড়পর্বত, বাড়িঘর, নদনদী আর সাগর মহাসাগরকেই ধরে রাখে না, বায়ুমণ্ডলকেও ধরে রাখে।

অ্যারিস্টটলও এটা জানতেন না। তাই স্বয়ং অ্যারিস্টটল তাঁর শিষ্যরা ও অনুগামীরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে আসলে কোন প্রাণীর বসতি নেই। যদিও প্রাচীনকালের কোন কোন পণ্ডিত দক্ষিণ গোলার্ধে প্রতিপাদী প্রাণীদের বাস আছে বলে এর আগেই মত পোষণ করতেন।

http://allbengalibooks.blogspot.com

প্রথম পৃথিবী পরিমাপ

মহাবীর আলেকজান্ডার তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে অর্ধেক পৃথিবী পরিক্রমা করেন। মিশরে, নীলনদের একটি শাখার তীরে, বাণিজ্যপথসমূহের কর্মব্যস্ত সংযোগস্থলে তিনি এক নগর প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। নগরের নাম হয় আলেকজান্দ্রিয়া। বছরের পর বছর পার হয়ে গেল। নির্বাচিত জায়গাটা লোকের ভালোই লাগল, আর সেখানে বসবাস করতে ইচ্ছুক এমন লোকজনেরও অভাব ঘটল না। শহর তাই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলল। নবাগতরা শহরের চওড়া চওড়া রাস্তাঘাট আর কাঁচা ইটের তৈরি বহুতলা দালানকোঠা দেখে অবাক হয়ে যেত। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার সত্যিকারের বিস্ময় ছিল তার মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার। মিউজিয়ম অর্থাৎ কাব্য, কলা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী মিউজদেবীদের মন্দির আসলে ছিল বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিজ্ঞান আকাডেমি। তাবৎ বিশ্বের জ্ঞানসাধক, কবি ও দার্শনিকরা মিউজিয়ামে বাস করতেন, কাজ করতেন। তাঁরা আগ্রহী লোকজনের জন্য ভাষণ দিতেন, নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, অভিযান চালাতেন, লিখতেন লম্বা লম্বা কাগজে পাকানো পুথি–এই কাগজে পাকানো পুথিগুলো আবার মোটা চামড়ার খাপে পুরে রাখা হত। এই খাপগুলো রাখা হত সংরক্ষণাগারে, যার নাম ছিল গ্রন্থাগার। কালে এখানে কয়েক লক্ষ হাতে লেখা পুথি জমা হয়।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এরাতোস্থেনাস নামে এক ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ মিউজিয়মে বাস করতেন। তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের আদি গ্রন্থাগারিকদের একজন। এরাতোস্থেনাসের খ্যাতির বিশেষ কারণ ছিল এই যে সেই সময়কার বিদিত সমস্ত দেশের ভৌগোলিক বিবরণ লেখা ছাড়াও তিনি ভূগোলকের আয়তন পরিমাপ করেন। ঘটনাটা ঘটে এই ভাবে...

সিয়েনে (মিশরীয় শহর সুন, বর্তমান আসুয়ানের প্রাচীন গ্রীক নাম) থেকে আগত বণিকদের মুখে তিনি শুনতে পেলেন যে সূর্যের উত্তরায়ণের দিনে—বছরের দীর্ঘতম দিনে–মধ্যাহ্নে সূর্যের কিরণ শহরের গভীরতম কূপের তলদেশের জল পর্যন্ত আলোকিত করে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে সূর্যের কিরণ ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে। এরাতোস্থেনাস জানতেন যে সিয়েনে থেকে আলোকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণ থেকে উত্তরে দূরত্ব পাঁচ হাজার স্তাদিয়া

http://allbengalibooks.blogspot.com

(এক স্তাদিয়া হল ১৮৫.২৫ মিটার)। এই দূরত্ব পরিমাপ করে কারাভানের দলপতিরা। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় ঐ দিনই সূর্যকিরণ খাড়া হয়ে না পড়ে পড়ছে কাত হয়ে। সূর্যকিরণের এই নতির ফলে যে-কোণ সৃষ্টি হচ্ছে তা একটি পূর্ণবৃত্তে আবদ্ধ কোণের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। এরাতোস্থেনাস এবারে স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে দুই শহরের মধ্যকার দূরত্ব হল ভূগোলকের মোট পরিধির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পাঁচ হাজার স্তাদিয়াকে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করে এরাতোস্থেনাস পেলেন ২ লক্ষ ৫০ হাজার স্তাদিয়া অর্থাৎ আনুমানিক ৪২-৪৩ হাজার কিলোমিটার।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর বৃত্তের মোট পরিধি বর্তমান কালের বিজ্ঞানীদের হিসাবমতে ৩৯,৯৪০ কিলোমিটার। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে এরাতোস্থেনাসের ভুল ছিল নগণ্য।

এরাতোস্থেনাসের রচনার সামান্য কিছু অংশই রক্ষা পেয়েছে। তাঁর রচনা সম্পর্কে আমরা বেশি জানতে পারি পরবর্তীকালের অন্যান্য গ্রন্থকারদের লেখা থেকে।

আর সব প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের মতো এরাতোস্থেনাসও প্রধান মনোযোগ আকর্ষণ করেন ভূমধ্যসাগরীয় ভূখণ্ডের প্রতি। তাঁদের মতে, এই ভূখণ্ডটি মহাসাগর বেষ্টিত এক বিশাল দ্বীপ, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে এর অবস্থান। তাঁদের সাধারণ বিশ্বাস ছিল এই যে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলটি গ্রীষ্মের ভয়ঙ্কর আধিপত্য হেতু বসবাসের অযোগ্য। দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সম্পর্কে অবশ্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেছেন যে সেখানে প্রতিপাদী অধিবাসীদের বসতি থাকলেও থাকতে পারে।

গ্রীকদের বিবরণ অনুযায়ী তাঁদের 'দ্বীপ-ভূখণ্ডের' বহিঃরেখা রঙবেরঙের আয়তক্ষেত্রাকার কাপড়ের টুকরোয় তৈরি এক ধরনের গ্রীক আঙরাখার মতো। এছাড়া দার্শনিকরা স্থলভাগকে ইউরোপ এশিয়া ও লিবিয়া—এই তিনটি অংশে ভাগ করেন। এদিকে রোমকরা লিবিয়া দেশে বসবাসকারী প্রবল পরাক্রান্ত আফ্রিগিয়া গোষ্ঠীর নাম অনুযায়ী লিবিয়ার নাম বদল করে রাখলেন আফ্রিকা।

http://allbengalibooks.blogspot.com

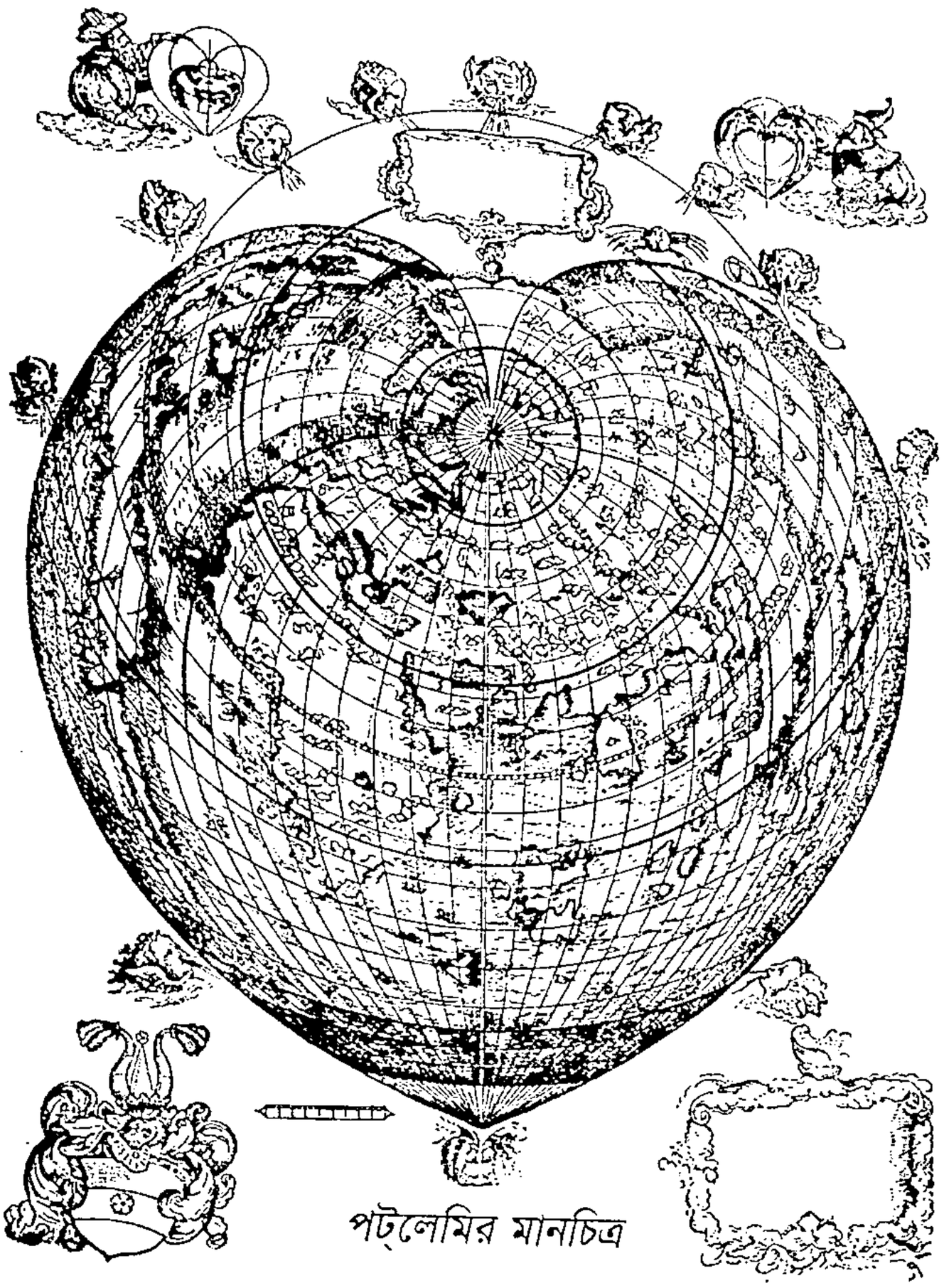

পট্‌লেমির মানচিত্র

প্রাচীন কালের পাণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই প্রথম
সমাক্ষরেখা ও মেরুরেখার প্রচলন করেন বলে ধরা হয়।

পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলোর মাঝখানের জলভাগ দিয়ে জাহাজ চালানোর সময় নাবিকেরা দিক ঠিক রাখত কী ভাবে? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লোকে স্তাদিয়া বা দিনের হিসাবে পৃথক পৃথক জায়গাগুলোর মধ্যকার দূরত্ব সম্পর্কে তথ্যাদি জানত, একে অন্যকে জানাতও। গতিপথ আরও সহজসাধ্য এবং পথ আরও নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গ্রীক ভৌগোলিকেরা ভ্রমণকারীদের সুপরিচিত জায়গাগুলোর উপর দিয়ে কতকগুলো লম্বালম্বি রেখা টানে। সেই রেখাগুলোর একটি—মধ্যচ্ছদা—শুরু হয়েছে হারকিউলিস স্তম্ভ (জিব্রাল্‌টার প্রাণালী) থেকে, তারপর

http://allbengalibooks.blogspot.com

ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে, মেসিনা প্রণালী ও পেলোপ্যানিসাসের দক্ষিণপ্রান্ত ভাগ হয়ে চলে গেছে রোডস দ্বীপের দিকে, আরও দূরে বিস্তৃত হয়েছে এশিয়া মাইনর পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পাদদেশ বরাবর। মধ্যচ্ছদা বিষুবরেখার সমান্তরালে গিয়ে পৃথিবীকে দুই অংশে ভাগ করেছে। দক্ষিণে নীলনদের উপত্যকায় মেরোয়ে (নুবিয়া, বর্তমানে সুদানের একটি অংশ) রাজ্য থেকে শুরু করে আরেকটি রেখা এই মধ্যচ্ছদাকে ছেদ করেছে। রাজ্যের রাজধানী থেকে এই রেখা নীলনদের ওপর দিয়ে উত্তরে চলে গেছে আলেকজান্দ্রিয়া অবধি, তারপর রোডস দ্বীপ আর বাইজানটাইমের ভেতর দিয়ে বস্ফরাস বা নীপারের মুখে। এই রেখাগুলো মানচিত্র তৈরির কাজ অনেকাংশে সহজসাধ্য করে তোলে।

তারপর এই দুই রেখার সমান্তরাল আরও নতুন নতুন রেখা প্রাচীন জগতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ওপর দিয়ে টানা হল। আর খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, ভৌগোলিক ও আবহবিদ ক্লডিয়াস পট্‌লেমি পুরো মানচিত্রটাকেই নানা সমাক্ষরেখা ও মধ্যরেখায় ঢেকে দিলেন। সমাক্ষরেখাগুলো যায় নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরালে আর মধ্যরেখা উত্তর মেরু থেকে শুরু হয়ে সেগুলোকে ছেদ করে চলে যায়।

স্থলভাগ যে একটা দ্বীপের মতো, প্রাচীনদের এই মত পট্‌লেমি মেনে নিতে পারলেন না। ফিনিশীয় নাবিকদের অভিজ্ঞতায় তিনি আস্থা পোষণ করতে পারলেন না। তাঁর মতে, স্থলভাগ উত্তরে না দক্ষিণে কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে এ সম্পর্কেও সঠিক কথা কেউ বলতে পারে না। এই কারণে পট্‌লেমি তাঁর পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করার সময় স্থলভাগের প্রান্তদেশ পর্যন্ত স্রেফ টেনে বাড়িয়ে লিখে দিলেন যে এরপর আছে 'অপরিচিত ভূমি'।

এশিয়ার উত্তরে ও পুবে অথবা আবিসিনিয়ার দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ মহাসাগর আছে সে কথা তিনি কোনমতেই মানতে নারাজ। তাঁর বর্ণনার ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা নতুন করে পৃথিবীর যে মানচিত্র গঠন করলেন তাতে ভারত মহাসাগর চারপাশ থেকে বদ্ধ এক সমুদ্রে পরিণত হয়েছে আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অজানা স্থলভাগের সাহায্যে সংযুক্ত হয়েছে সরাসরি পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

কার কথা তবে সত্যি? এরাতোস্থেনাসকে যদি মানতে হয় তাহলে সমুদ্রযাত্রী নাবিকদের পক্ষে জাহাজে চড়ে পৃথিবীর যে কোন দূর দেশে পৌঁছুন সম্ভব। আর পট্‌লেমি যদি সত্যি হন তাহলে জাহাজের চলাচল বদ্ধ সাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাই দূরযাত্রায় স্থলপথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

ক্লডিয়াস পট্‌লেমি প্রাচীন বিজ্ঞানের শেষতম উজ্জ্বল ধারক রূপে গণ্য। তিনি এমন এক যুগের মানুষ যখন প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির দীপশিখা নিভু নিভু। সেই সময় পৌত্তলিকতার স্থান নিতে চলেছিল নতুন নতুন ধর্মবিশ্বাস। পৃথিবী যে চেপ্‌টা এই ধারণা ফের এশিয়ায় ও ইউরোপে ব্যাপক প্রসার লাভ করল। বলাই বাহুল্য আমাদের গ্রহের সঠিক আকার জানার পথে এটা ছিল পিছু হটা।

প্রাচীন স্লাভ ভাষার পুরনো অক্ষরে হাতে লেখা এক পেল্লাই পুথি আছে। বইটার নাম: 'সমগ্র ভূমণ্ডল ব্যাপনকারী খ্রীস্টসংক্রান্ত গ্রন্থ'। রচয়িতা কোজমা নামে ষষ্ঠ শতাব্দীর এক গ্রীক বণিক। ইন্ডিকোপ্লভ নামেও তিনি পরিচিত। এই শেষোক্ত নামটি রীতিমতো সম্মানসূচক, কেননা তার অর্থ, এই নামধারী ব্যক্তিটি দূর ভারতবর্ষ পর্যটন করেছেন।

কোজমা অবশ্য বাণিজ্যসূত্রে সত্যিই অনেক ভ্রমণ করেন। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আর তখনই, মঠে থাকাকালে তিনি পৃথিবীর গঠনবৃত্তান্তসংক্রান্ত বইটি লেখেন। সন্ন্যাসধর্মগ্রহণকারী এই ভূপর্যটক বণিকের বৃত্তান্তের ভিত্তি খ্রীস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। বাইবেলের মত অনুসরণ করে তিনি লিখেছেন যে পৃথিবী চেপ্‌টা আয়তক্ষেত্র। আয়তক্ষেত্রাকৃতি পৃথিবীর চারধারের তীরভূমি মহাসাগরের তরঙ্গমালাবিধৌত, আর মহাসাগর নিজেও উঁচু প্রাচীরে আবদ্ধ। প্রাচীরের ওপর ভর দিয়ে আছে দৃঢ়, স্বচ্ছ, গম্বুজাকৃতি নভোমণ্ডল। দেবদূতেরা নভোমণ্ডলের ওপরে চালাচালি করছেন নক্ষত্র।

কোজমার মতে, আকাশের শক্ত চালার ওপাশে সংরক্ষিত আছে দিব্য বারি। এই দিব্য বারিই সময় সময় বৃষ্টি হয়ে আমাদের পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। আর উত্তরে এই শ্রদ্ধেয় বণিক স্থান দিলেন এক উঁচু পাহাড়ের। আকাশপরিক্রমা কালে সূর্য এর আড়ালে অন্তর্ধান করে। তখনই পৃথিবী জুড়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে রাতের আঁধার।

http://allbengalibooks.blogspot.com

বইটিতে অনেক ছবি আঁকা। কিছু কিছু ছবি রুশী অনুলিপিকররা মূল গ্রীক থেকে নিয়েছেন, কিছু নিজেরাই কল্পনা করে এঁকেছেন। কোজমা যে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করেছেন সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজের চোখে যা যা দেখেছেন তা বাদে অনেক শোনা কথাও লিখেছেন। তাই উট, ষাঁড় বা হাতির মতো সচরাচরদৃষ্ট জীবজন্তুর পাশাপাশি ছবিগুলোতে কাল্পনিক 'গজবরাহ', 'নাসিকাশৃঙ্গ' ও 'একশৃঙ্গদানব'ও দেখতে পাওয়া যায়।

এই বইটি যে কবে প্রথম রুশদেশে আসে বলা কঠিন। অনুবাদকের নামও জানা যায়নি। তবে অনেককাল আগেকার ঘটনা বটেই। সব দেশের লোকই ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে অথবা শুনতে ভালোবাসত। লেখাপড়া জানা রুশীদেরও আলেকজান্দ্রিয়ার বণিক কোজমার বইটি পছন্দ হয়। তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পার: 'এর মধ্যে এত উদ্ভট উদ্ভট কল্পনাই যদি থাকে তবে পছন্দ হল কী করে?' পছন্দ করার কারণ প্রথমত এই যে, লোকে এটা জানত না, তারা সবটাই সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁর বৃত্তান্ত পড়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও দূর দূর দেশ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে।

প্রাচীন রাশিয়ায় সাগরপারের দেশের বর্ণনা ও পৃথিবীর গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে গ্রন্থাদি খুব একটা কম ছিল না। একটি বইয়ের নাম ছিল 'অগাধগ্রন্থ'—'অগাধ' এই কারণে যে তাতে অগাধ জ্ঞানের কথা, তত্ত্বকথা নিবদ্ধ ছিল। এই গ্রন্থে কল্পিত জ্ঞানী পুরুষ দাভিদ এভসেইয়েভিচ বলছেন যে পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে 'তিমিমাছ'। তিমিমাছ যেই পাশ বদল করে অমনি জননী বসুন্ধরা আগাগোড়া টলমল করে ওঠেন।'

http://allbengalibooks.blogspot.com

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–১

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কাদের নিয়ে গোষ্ঠী সভা তৈরি করা হবে?

২. চিনের পরিব্রাজকের মধ্যে যারা পাহাড়-পবর্ত ডিঙ্গিয়ে এসেছিল তারা কি দেখে আশ্চর্য হয়েছিল?

৩. ভারতীয় দার্শনিক, মহাপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞদের মতে পৃথিবী দেখতে কেমন ছিল?

৪. পৃথিবী গোলকার এই ধারণা প্রথম কার?

৫. কোন মহাদেশ জ্ঞান সাধক আর মনীষীদের পীঠস্থান আখ্যা পেয়েছিল?

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১. মানুষ আদি বাসস্থান ছাড়ার কারণ কি?

২. মানুষ কীভাবে একসঙ্গে বসবাস করতে শিখল?

৩. প্রথম কীভাবে কৃষি কাজের সূত্রপাত হয়েছিল?

৪. ফিনিশীয় সমুদ্র-অভিযাত্রীদের কাছে পৃথিবী দেখতে কেমন মনে হয়েছিল?

৫. পৃথিবী দেখতে কেমন, কী রকম তার আকার? এই নিয়ে প্রথম কারা মাথা ঘামান?

http://allbengalibooks.blogspot.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠ– ১.২

- আরব তথা মুসলিম পর্যটকদের গবেষণায় পৃথিবীর আকার কেমন মনে হয়েছিল?
- আরবদেশীয় ভৌগোলিকের রৌপ্যমানচিত্র তৈরির ইতিহাসের বর্ণনা।
- দূর যাত্রার মানচিত্র উদ্ভাবন কীভাবে হয়েছিল?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে তোমরা আরও জানতে পারবে–

- ❖ মানচিত্র থেকে ভূগোলক তৈরির মজার তথ্য
- ❖ ভূগোলক তৈরির আশ্চর্য কাহিনীর বর্ণনা
- ❖ সুপ্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর আকার ও আয়তন জানার জন্য মানুষের সীমাহীন আগ্রহের ইতিহাস।
- ❖ ফুটি নাকি আপেল– কিসের মত পৃথিবী-এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা কি হতে পারে?

http://allbengalibooks.blogspot.com

আরব তথা মুসলিম পর্যটকদের ধারণা

উ: মধ্যযুগে সবচেয়ে দুঃসাহসী ভ্রমণকারীরূপে দেখতে পাই আরবদের। উ: সপ্তম শতাব্দীতে বিশাল ভূখণ্ড জয় করার পর তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্য চালানের কাজ শুরু করেন। আরবীয় বণিকেরা পূর্ব ইউরোপ, স্লাভ ভূখণ্ডের সবগুলো দেশ এবং মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। তাঁরাই প্রথম বিষুবরেখার খানিকটা দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকার আশ্চর্য আশ্চর্য দেশের বিবরণ দেন, মাদাগাস্কার দ্বীপ সমেত পূর্ব আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোর সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটান।

তৎকালীন ভৌগোলিক তত্ত্ব সম্পর্কে লিখিত যে সমস্ত বিবরণ আমাদের হাতে এসে পড়েছে সেগুলোর একটির রচয়িতা হলেন নবম শতাব্দীর পারস্যদেশীয় পণ্ডিত ইবন হর্‌দাবেহ্। বইটির নাম 'বিভিন্ন পথ ও রাজ্যের বিবরণী গ্রন্থ'। নিজে তিনি ভ্রমণ করেন কম। কিন্তু বাগদাদের খলিফার দরবারে থাকার ফলে আরবীয় বণিক, কর্মচারী ও ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অসংখ্য তথ্য কাজে লাগিয়েছেন তিনি।

ইবন হর্‌দাবেহ্-এর স্বল্প কিছুকাল পরে দেখা দিল পর্যটক ইব্‌ন রশীদ-এর লেখা বিবরণ। তিনি নিজে যা দেখেছিলেন তাই লেখেন। তিনি তাঁর রচনার নাম দেন 'রত্নকোষ'। পাণ্ডুলিপির শেষ–সপ্তম পরিচ্ছেদ আজও রয়ে গেছে। পূর্ব ইউরোপের জাতিবর্গ সম্পর্কে নানা তথ্য ঐ অংশে আছে। সেখানে ইব্‌ন রশীদ যে স্লাভজাতি ও কিয়েভ রুস্ (প্রাচীন রাশিয়া ঐ নামেই পরিচিত ছিল)-এর বিবরণ দিয়েছেন পশ্চিম ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীরা তাদের সম্পর্কে অতি সামান্য জানত।

দশম শতাব্দীতে পূর্ব ইউরোপের জাতিবর্গ সম্পর্কে আরও তথ্য দেন ইব্‌ন ফাদ্‌লান তাঁর লেখা 'ভোল্‌গাযাত্রায়'।

বাগদাদনিবাসী মাসুদি পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সমস্ত দেশ, ককেশাস ও পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ করেন। কারাভানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা পরিভ্রমণ করেন, চীন আর যবদ্বীপও তিনি জানতেন। তাঁর লিখিত একটি গ্রন্থের নাম 'সুবর্ণভূমি ও হীরকখনি', অন্যটি–'সমাচার ও পর্যবেক্ষণ'।

মধ্যযুগীয় এমন অনেক পর্যটকের কথা আমি তোমাদের বলতে পারি

http://allbengalibooks.blogspot.com

যাঁরা আমাদের জন্য মহামূল্যবান রচনার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। যেমন উল্লেখ করতে পারি খরেজ্‌মনিবাসী জ্ঞানকোষ রচয়িতা পণ্ডিত আল-বিরুণীর নাম; নাম করা যায় সর্বকালের, সর্বজাতির শ্রেষ্ট পর্যটক ইব্‌ন বতুতার, যিনি তাঁর পঁচিশ বছর পর্যটন-জীবনে অন্ততপক্ষে ১,২০,০০০ কিলোমিটার পাড়ি দেন। কিন্তু মুসলিম পর্যটক ও ভৌগোলিকরাও পৃথিবীকে চেপ্‌টা বলে কল্পনা করেন।

কেবল তফাত এই যে খ্রীস্টানদের মতো পৃথিবীর আকার আয়তক্ষেত্র না বলে তাঁরা বলেছেন গোল। তাঁরা তাঁদের মানচিত্রে পৃথিবীর এমন চিত্রই এঁকেছেন। এই রকম একটি চিত্রের কথা আমি তোমাদের আরও পরে বলব।

মানচিত্র উদ্ভাবন

সুপ্রাচীনকালে লোকে তাদের আশপাশ অঞ্চলের নক্সা আঁকতে পারত। তা নইলে কী করেই বা বোঝানো যায় কোথায় ভালো শিকার পাওয়া যায়, কোথাকার ফলমূল বেশি মিঠে? পরে এই আদিম ভৌগোলিকরা তাদের নক্সায় আশপাশের পল্লীগুলোরও ছবি আঁকতে লাগল। ছোট ছোট পথরেখা এঁকে সেগুলো যুক্ত করল। আর যখন প্রথম কারাভান বাইরের দেশে যাত্রা করল তখন কারাভান চলার দীর্ঘ পথঘাটের নক্সা এবং বিবরণও তৈরি করতে হল।

উ: খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক আনাক্সিমান্দর তৎকালীন পরিচিত বহু বিবরণ সংগ্রহ করে সমগ্র পৃথিবীর একটা নক্সা আঁকার চেষ্টা করেন। এই ভাবে সৃষ্টি হল প্রথম মানচিত্র।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষ্ণসাগরের অদূরে মাইকোপ নামে একটি শহর আছে। বেলায়া নদীর তীরে এই শহর। তেমন একটা পুরনো নয়, একশো বছরের সামান্য ওপরে হতে পারে তার বয়স। শহরের অদূরে উঁচু হয়ে আছে একটা ঢিবি। কবে যে ওখানে মাটি স্তূপাকার করা হয়েছিল কেউ বলতে পারে না। কেনই বা করা হয়েছিল তাও লোকে বহুকাল হল ভুলে গেছে। অবশেষে একদিন প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ঠিক করলেন ঢিবিটা খুঁড়েই দেখা যাক না। হতে পারে যে ওর ভেতরে এমন সমস্ত জিনিস আছে যা থেকে কোন এক সময় এখানে সংঘটিত ঘটনার

http://allbengalibooks.blogspot.com

ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব!

যা বলা তাই কাজ। বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য তৈরি হলেন পণ্ডিতেরা। ঢিবিটার কাছে এলেন তাঁরা। কোপানো শুরু হয়ে গেল। এক দিন গেল–কিছুই না। দুদিন যায়, তিনদিন যায়–কোদালে ওঠে কেবল চাপ চাপ মাটি, কেবল বালি আর পাথর উড়তে থাকে খোঁড়া জায়গাটার ভেতর থেকে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁরা তখন ভাবতে শুরু করেছেন এই বাজে কাজে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। এমন সময় তারা সন্ধান পেলেন গুপ্তধনের।

গুপ্তধনই বটে! কী নেই সেখানে! মাটিতে চাপা পড়ে ছিল একটা সমাধি। সমাধির মাথার ওপরে সোনার তবকে কারুকাজ করা জমকাল চাঁদোয়া। চাঁদোয়াটা খাড়া আছে চারটে রূপোর থামের ওপর। প্রতিটি থামের শেষ প্রান্তে রূপো আর সোনার তৈরি একটি করে পাকানো শিঙওয়ালা ষাঁড়ের অপূর্ব মূর্তি। এরই পাশে খুঁড়ে পাওয়া গেল সোনারূপোর সুন্দর তৈজসপত্র, বহু রকমের অলঙ্কার। সমস্ত হাতিয়ার আর অস্ত্রশস্ত্র ছিল পাথর আর খাঁটি তামার তৈরি। চমৎকার গুপ্তধন!

বোঝাই যাচ্ছিল কোন এক সময় কোন এক বড় ও ঐশ্বর্যবান গোষ্ঠীর দলপতি মারা যায়। হয়তো বৃদ্ধ বয়সে মারা যায়, হয়তো বা শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায়। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, লোকটি এতই শ্রদ্ধার পাত্র ছিল যে যোদ্ধারা পরম সম্মানের সঙ্গে তাকে সমাধিস্থ করে।

কিন্তু পণ্ডিতেরা যাতে বেশি উল্লসিত হন তা সোনা নয় রূপোও নয়। উদ্ধার করা সামগ্রীর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের ছিল চার ধারে আঁকা গোলাকার চীনেমাটির কিছু পাত্র। ঐ কলসিগুলোর ভিতরে কোন এক সময় তৈল ও সুরা রাখা হত। অজ্ঞাতনামা শিল্পীরা মাটির গায়ে এঁকে রেখেছেন ককেশাস পর্বতমালা আর নদী–যে নদী ঐ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। দেখতে হয়েছে সত্যিকারের নক্সা, আর এমনই নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ যে আঁকা জায়গাগুলো প্রত্নতত্ত্ববিদদের বার করতে কোন বেগ পেতে হল না।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল উদ্ধারপ্রাপ্ত নির্দশনের বয়স। পাত্রগুলো কম করে হলেও চার হাজার বছরের পুরনো! সেই সময় এখানকার তৃণভূমিতে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে অক্ষরপরিচয় না

http://allbengalibooks.blogspot.com

জানাই ছিল স্বাভাবিক, অথচ এলাকার মানচিত্র তারা ঠিক আঁকতে পারত।

সম্প্রতি তুরস্কদেশে খননকার্য করে প্রাচীন পল্লীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের সময় প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটির ফলকের গায়ে আঁচড়-কাটা নক্সার সন্ধান পেয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নিদর্শনটি নয় হাজার বছরের পুরনো। আজ এই মানচিত্রটি পৃথিবীর প্রাচীনতম রূপে গণ্য। সত্যি সত্যি তাই কিনা কে বলতে পারে? বলা যায় না কোথাও হয়তো আরও পুরনো আছে? নেহাৎ আমরা খুঁজে পাইনি এখনও?

আরবদেশীয় ভৌগোলিকের রৌপ্যমানচিত্র

উষ্ণ ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে সিসিলি একটা বড় দ্বীপ। সেখানকার পালের্মো শহরে আবু আবদাল্লা মুহম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিসি নামে এক আরব ভূগোলবিদ পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যশালী রাজপরিবারের সন্তান। বহু বছর তিনি অধ্যয়ন করেন, বহু ভ্রমণ করেন, পরম জ্ঞানীপুরুষরূপে পরিচিত হন।

সেই সময় পালের্মো শাসন করতেন সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজার। জন্মসূত্রে তিনি ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নর্মান্ডির লোক, কিন্তু ভাগ্যের তাড়নায় তিনি এসে পড়েন উষ্ণ জলবায়ুর দেশ সিসিলিতে। এখানেই থেকে গেলেন। রাজা রজার উত্তরের দেশগুলো খুব ভালো জানতেন, এর জন্য তাঁর গর্ব ছিল, তিনি ভূগোলের ভক্ত ছিলেন। (অবশ্য এটাই স্বাভাবিক–আমরা যা বেশি ভালো জানি, তাই বেশি ভালোবাসি।)

ভূগোলবিশারদ পণ্ডিতের কথা রাজার কানে গেল। লোকমুখে তিনি শুনতে পেলেন দক্ষিণের দেশগুলো সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ভালো জ্ঞান আর কারও নেই। রজার তখন পৃথিবীর বসতিপূর্ণ সমস্ত ভূভাগের যতদূর সম্ভব বিশদ ও যথাযথ, সুবৃহৎ এক মানচিত্র যৌথভাবে রচনার উদ্দেশ্যে ইব্‌ন ইদ্রিসিকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন।

উ: ভাবনা ও জ্ঞান আশ্চর্য জিনিস বটে!–রূপকথার সেই টাকার মতো—যতই খরচ কর না কেন এর কোন শেষ নেই। প্রাচীন প্রবচনের ভাষায়: তোমার আমার দুজনের কাছেই যদি একটি করে আপেল থাকে, আমরা দুজনেই যদি নিজেদের মধ্যে তা বদলাবদলি করি, তাহলেও

http://allbengalibooks.blogspot.com

আমাদের একটি করে আপেল থেকেই যায়। কিন্তু তোমার আমার দুজনেরই যদি ভাবনা আর জ্ঞান থাকে, আর তা যদি আমরা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করি, তাহলে দুজনের প্রত্যেকের ভাবনা ও জ্ঞান হবে দ্বিগুণ বেশি।

ইব্‌ন ইদ্রিসি রাজার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হলেন, কেননা তাঁরা দুজনে মিলে মানচিত্র আরও পরিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন।

'কিন্তু এত বড় একটা কাজ কোন্ উপাদানের ওপর রূপদান করা উচিত?' ভৌগোলিককে রাজা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর মনে হয় সাধারণ কাগজ তাঁদের মানচিত্রের পক্ষে বড় বেশি সাদামাঠা, আর তা টেকসইও হবে না। আরবদেশীয় পণ্ডিত কী উত্তর দেন জানা যায়নি। কিন্তু রাজা তাঁর কোষাগার থেকে সমস্ত রূপো বার করে এনে তা গলিয়ে ও পিটিয়ে যত বড় আকারের হতে পারে একটা গোল রূপোর পাত বানানোর হুকুম দিলেন। তার ওপরই চিরকালের জন্য আঁকা হবে এই অপূর্ব মানচিত্রটি। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আরবীয় পণ্ডিতদের মতে পৃথিবী চেপ্‌টা, তবে যোদ্ধার ঢালের মতো গোল।

রাজার মুখের কথাই আইন। কাজে রেগে গেল প্রথমে ঢালাই কারিগরেরা তারপর স্বর্ণকারেরা। অবশেষে চারজন লোক ধরাধরি করে ভারী রূপোর পাতটাকে কষ্টেসৃষ্টে ভৌগোলিকের কাজের ঘরে নিয়ে গেল। এর পর থেকে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে আবু আবদাল্লা মুহম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিসি মহামূল্যবান ধাতুর ওপর এঁকে, খোদাই করে, মুদ্রাঙ্কনপ্রণালীর সাহায্যে চাপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন তাঁর এবং রাজা রজারের জানা দেশ ও ভূখণ্ডের দেহরেখা।

মানচিত্র শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু রাজা মারা গেলেন। কিন্তু আরবীয় ভৌগোলিক কাজটা শেষ করে ছাড়লেন। যেমন ভাবা গিয়েছিল মানচিত্র তেমনি দাঁড়াল। বিশাল পাতের ওপর রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন দেশের সাগর-মহাসাগর, নদনদী, পাহাড়পর্বত ও মরুভূমি, আর দীর্ঘ পাকানো কাগজে সুন্দর করে লেখা হয়েছে মানচিত্রের ব্যাখ্যা।

রাজা এবং ভৌগোলিক দুজনে কিন্তু কেবল একটাই ভুল করেছিলেন। দেখা গেল, [উ:] রূপো মোটেই দীর্ঘস্থায়ী ধাতু নয়। অচিরেই রাজার

http://allbengalibooks.blogspot.com

উত্তরাধিকারীদের টাকাপয়সার অভাব দেখা দিল, রূপোর মানচিত্রও সঙ্গে সঙ্গে লোপাট হয়ে গেল। ইব্ন ইদ্রিসি যদি সাধারণ কাগজের ওপর এর প্রতিলিপি এঁকে না দিতেন, তাহলে এই মানচিত্র সম্পর্কে কিছুই আমরা জানতে পারতাম না। তাঁর আঁকা প্রতিলিপিগুলো বহু বছর বিশ্বস্তভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের সেবা করেছে, এমন কি আজও টিকে আছে। তাহলেই বোঝ, রূপো না কাগজ—কোনটা বেশি টেকসই?

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথিবী সম্পর্কে শেষতম যা যা তথ্য জানা ছিল, আরবীয় ভৌগোলিকের মানচিত্রে সেসবের সমাবেশ দেখা যায়। এটা অবশ্য ঠিক যে পৃথিবীর সঙ্গে লোকের তখনও তেমন একটা ভালোমতো পরিচয় ছিল না, আর যেটুকু লোকে জানত না সেটুকু কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নিত। এই কারণে ইব্ন ইদ্রিসি ও দ্বিতীয় রজারের মানচিত্রে এমন সমস্ত জিনিস দেখতে পাওয়া যায় বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই, ছিলও না। কিন্তু এই গলদ হল একালের দৃষ্টিতে, আজ থেকে আট শতাব্দী আগে এই মানচিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা কারও ছিল না।

ঘরকুনোদের জন্য মানচিত্র

উঃ ঘরকুনো কারা। তাদের সম্পর্কে জানা যাক—

তাদেরকেই ঘরকুনো বলা হয়ে থাকে, যারা ভ্রমণ করতে ভালোবাসে না, যাদের বেশি পছন্দ হল ঘরে বসে পানাহার করা আর মিথ্যাবাদী ও হামবড়া মুসাফিরদের যত রাজ্যের গাঁজাখুরি বানানো গল্প শোনা। এ ধরনের ঘরকুনোদের মুখ চেয়েই হরেক রকমের আষাঢ়ে গল্প সংগ্রহ করে সন্ন্যাসীরা একটা মানচিত্র বানালেন। সে মানচিত্র এমনই যে তার দিকে তাকালে দূরদেশে যাত্রা করার আগে অতি দুঃসাহসী লোককেও রীতিমতো চিন্তা করতে হবে।

যেমন ধর, আঁকা আছে একঠেঙে লোকের ছবি। তোমরা ভাবছ বুঝি খোঁড়া? মোটেই না। আসলে কোন এক পর্যটক সন্ন্যাসীদের কাছে বলেছিল যে দূর ভারতবর্ষের কোথাও একঠেঙে লোকদের পুরো একটা গোষ্ঠী আছে, তারা খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। আর যখন বৃষ্টি শুরু হয় তখন তারা মাথার ওপরে পা তুলে দিয়ে পায়ের পাতাকে ছাতা হিসেবে ব্যবহার করে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

ধাপ্পাবাজদের বিবরণ অনুযায়ী, ঐ ভারতবর্ষেই বাস করে এমন এক জাতের মানুষ যাদের মাথা কুকুরের, পা জোড়া ঘোড়ার, এমনকি এতই হতভাগ্য অনাসৃষ্টি যাদের মুখবিবর নেই। পরম ঐশ্বর্যময়ী গঙ্গার তীরে ঘুরে ঘুরে এই মুখবিবরহীন লোকের কেবল ঘ্রাণভোজন করে বেঁচে থাকে। আর যখন ভ্রমণে বেরোয় তখন গাত্রবস্ত্রের নীচে রাখে একটিমাত্র বুনো ফল, যার সুবাস বহু দিন থেকে যায়।

আফ্রিকা প্রসঙ্গে সন্ন্যাসীরা স্রেফ মুণ্ডহীন কবন্ধ লোকজনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের চোখ, কান আর নাক নাকি বুকের ওপর।

মানচিত্রে দৈত্যদানবদের চিত্রও আছে। তাদের কান এত বিশাল আকারের যে কম্বলের মতো করে গায়ে জড়ানো চলে। যে লোকটা নীচের ঠোঁট দিয়ে সূর্যের আলো থেকে মুখ আড়াল করছে সে হল বিশালোষ্ঠ গোষ্ঠীর লোক।

সময় সময় মধ্যযুগীয় শিক্ষিত লোকজনের বইপুথির মধ্যে দার্শনিকদের লেখা এমন সমস্ত রচনার অনুবাদও দেখা যেত যেখানে আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। মোটকথা, যত বেশি সময় যেতে লাগল মানুষ ততই বেশি করে নানা তথ্যাদি সঞ্চয় করতে লাগল। পৃথিবী যে চেপ্‌টা এই মর্মে পবিত্র লিখনে যে রূপকথা ফাঁদা হয়েছে, অবিসংবাদিত ঘটনাগুলো তার প্রবল বিরুদ্ধাচারী হয়ে দেখা দিল।

আর তারপর যা ঘটল তাতে পৃথিবী যে চেপ্‌টা থালার মতো, এই ধারণা চিরকালের জন্য সরে গিয়ে উপকথার জগতে আশ্রয় নিল। উ: আমাদের গ্রহ শেষ পর্যন্ত আবার গোলক রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৫১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আটলান্টিক মহাসাগরগামী গুয়াডালকুইভির নদীর মোহানা থেকে বেরিয়ে পাঁচটি স্পেনীয় জাহাজ ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে, ব্রাজিলের উপকূল অভিমুখে যাত্রা করল। 'ত্রিনিদাদ' নামে এই ফ্ল্যাশশিপটি যাত্রা করল অভিযানের কমান্ডার ফার্দিনান্দ ম্যাগেলানের নেতৃত্বে। স্পেনের রাজাকে তিনি কথা দেন যে পশ্চিমের পথ দিয়ে তিনি পুবে অবস্থিত মালাক্কা বা মশলাদ্বীপপুঞ্জে পৌঁছুবেন।

তিন বছর বাদে, ১৫২২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, ভিক্টোরিয়া নামে নৌবহরের একমাত্র যে জাহাজটি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, প্রাক্তন কর্ণধার জুয়ান সেবাস্তিয়ান দে এলকানোর নেতৃত্বে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সেটি

http://allbengalibooks.blogspot.com

ফের এসে পড়ল গুয়াডালকুইভিরের মোহানায়। এই ভাবে সম্পন্ন হল মানবেতিহাসে প্রথম ভূপ্রদক্ষিণ, আর তাতেই চিরতরে প্রমাণিত হয়ে গেল যে পৃথিবী গোল!

দূর যাত্রার মানচিত্র

প্রথম আমলের ভ্রমণকারীদের জাহাজ যতক্ষণ অন্তর্বর্তী সমুদ্রের মধ্যে যাতায়াত করছে অথবা উপকূল থেকে তেমন একটা দূরে যেতে ভরসা পাচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর আকার কেমন এই নিয়ে ক্যাপ্টেনদের মাথা ঘামানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু স্বদেশের তীরভূমি থেকে তারা যত দূরে সরতে থাকে ততই ভূপৃষ্ঠের আকারের কথা বিবেচনা না করে যে সমস্ত মানচিত্র রচিত, সেগুলোর, অর্থাৎ পুরনো মানচিত্রগুলোর, ভুলত্রুটি আরও বেশি করে সংশোধন করতে হয় নাবিকদের।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুরু হল বড় বড় ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগ। উপকূলভাগ ছেড়ে পালতোলা জাহাজ মহাসাগরের বুক ভেদ করে যাত্রা করল। এটা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের দুঃসাহসী উদ্যোগ। কেন, তা তোমরা এখনই বুঝতে পারবে।

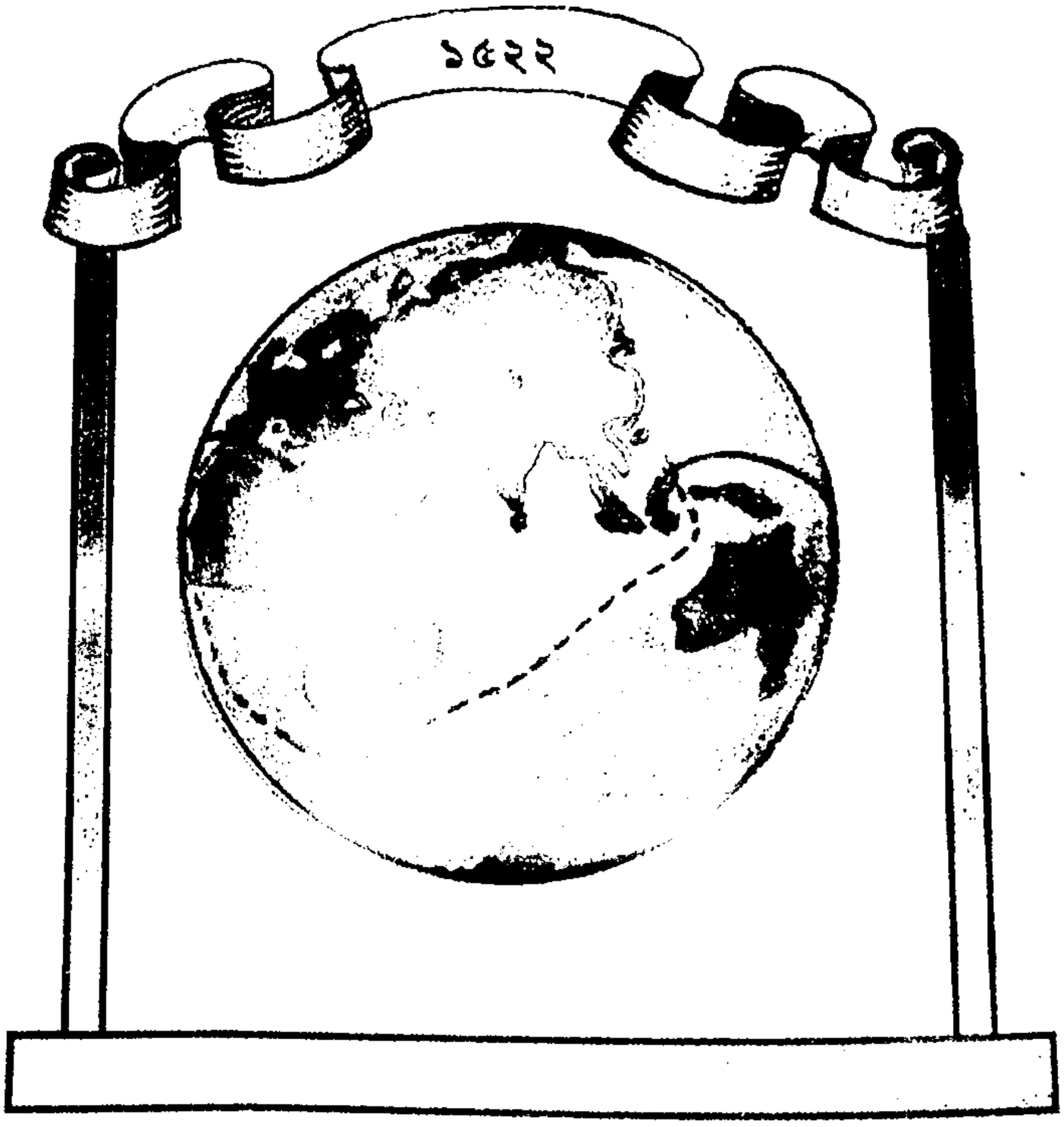

http://allbengalibooks.blogspot.com

আজকের দিনে যে-কোন দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েরা জানে যে পৃথিবীর যে-কোন জায়গার অবস্থান অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ–এই দুই স্থানাঙ্কের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকের দূরত্ব, অর্থাৎ দ্রাঘিমাংশ হিসাব করা হয় শূন্য থেকে নব্বই ডিগ্রি ধরে। আমরা বিশেষ করে এখানে ছবি এঁকে দিয়েছি যাতে সহজেই তোমাদের একটা চাক্ষুষ ধারণা হয়।

রাতের আকাশে ধ্রুবতারা অথবা দুপুরবেলায় সূর্য কতটা উঁচুতে আছে তা দেখে অক্ষাংশ সহজেই নির্ণয় করা যায়। অনেককাল থেকেই এর জন্য নাবিকদের মধ্যে কোণ মাপার বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির চল ছিল। সেগুলোর নাম সেক্সট্যান্ট, অ্যাস্ট্রলেব ও কোয়াডরান্ট। এই সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে খোলা সমুদ্রে সরাসরি জাহাজের ডেকের ওপর থেকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কতটা উঁচুতে আছে মাপা সম্ভব হত।

দ্রাঘিমাংশের ব্যাপারটা অবশ্য জটিলতর। দ্রাঘিমাংশ বলতে বোঝায় তুমি আমি যেখানে অবস্থান করছি সেই বিন্দুর মধ্যতল এবং শূন্যরূপে ধার্য মধ্যরেখার তলের অন্তর্বর্তী কোণ। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের গ্রিনীচ মানমন্দিরের ওপর দিয়ে যে মধ্যরেখা গেছে তাকেই প্রাথমিক বা শূন্য ডিগ্রি মধ্যরেখা ধরা হয়।

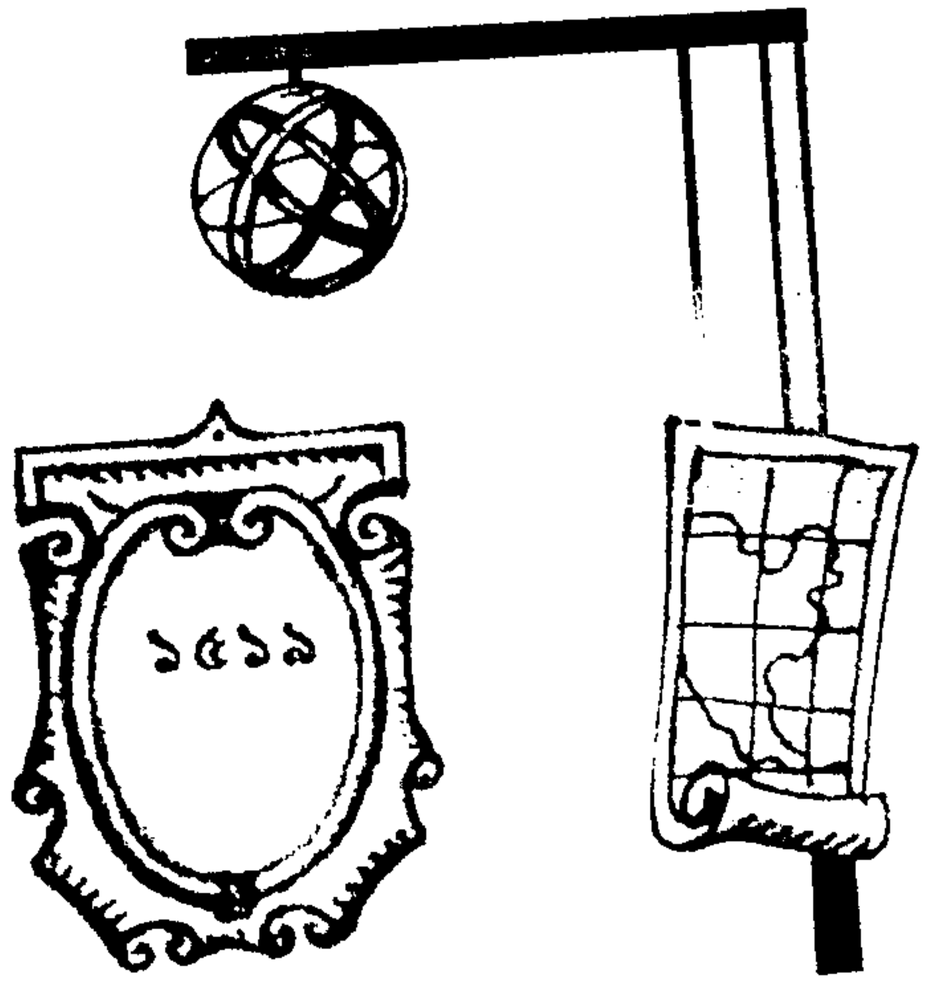

প্রাথমিক মধ্যরেখা ভূমণ্ডলকে ভাগ করেছে পূর্ব ও পশ্চিম–এই দুই গোলার্ধে, আর বিষুবরেখার বৃত্ত তাকে ভাগ করেছে প্রতিটি গোলার্ধকে

http://allbengalibooks.blogspot.com

১৮০ ডিগ্রি করে দুটি অর্ধে। (তোমরা নিশ্চয়ই জান যে একটা পুরো বৃত্ত হয় ৩৬০ ডিগ্রি।) পুবের দিকে শূন্য থেকে ১৮০ ডিগ্রি মধ্যরেখাকে বলা হয় পূর্ব দ্রাঘিমাংশ আর পশ্চিমের দিকে শূন্য থেকে ১৮০ ডিগ্রি-পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ। আঁকা ছবিটার দিকে তাকালে এটাও বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু খোলা সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা যায় কীভাবে? কয়েক শতাব্দী ধরে এটা কেউ বার করতে পারেনি। এই কারণে ঊ: প্রথম আমলে দূর সমুদ্রযাত্রায় বেরোবার সময় জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা হত কেবল অক্ষাংশ দিয়ে।

সেই সময় কর্ণধার আর ক্যাপ্টেনরা যে ভাবে জাহাজের গতিপথ নির্ধারণ করত তা লক্ষ্য করার মতো। ধরা যাক, পর্তুগালের উপকূলভাগ থেকে কোন জাহাজকে মহাসাগরের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে কোন দ্বীপের দিকে যেতে হবে। সবচেয়ে আগে ক্যাপ্টেনকে জেনে নিতে হবে গন্তব্যস্থলের অক্ষরেখার মধ্যাহ্নসূর্য কতটা উঁচুতে আছে। এর পর সে জাহাজ মহাসাগরের ভেতরে চালিয়ে এনে দক্ষিণে ঘোরাল। কম্পাসের কাঁটায় কাঁটায় জাহাজ চলতে লাগল যতক্ষণ না মধ্যাহ্নে সূর্য যথাযোগ্য উচ্চতায় এসে পৌঁছুল। তখন ক্যাপ্টেন নব্বই ডিগ্রি পশ্চিমে জাহাজের মোড় ঘুরানোর আদেশ দিলেন, এইভাবে দিনমণি সূর্য কতটা উঁচুতে আছে তা দেখে নিজেদের অবস্থান বুঝে অক্ষরেখা ধরে চলতে চলতে জাহাজ সোজা দ্বীপে এসে পৌঁছুল।

তোমাদের মধ্যে যারা দাবাখেলা জানে তারা সম্ভবত খেয়াল করেছে যে সমুদ্রযাত্রার এই পদ্ধতিটা অনেকটা দাবার ঘোড়ার চালের মতো। স্বীকার করতেই হবে, সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পক্ষে পদ্ধতিটা তেমন প্রশস্ত নয়।

এইভাবে নৌচলাচল নির্ভরযোগ্য নয় দেখে বহু দেশের সরকার নানা ধরনের বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করলেন, খোলা সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণের সমস্যা পূরণের জন্য বড় বড় পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিগুলো দেখা গেল হয় রীতিমতো জটিল, নয়তো সামান্যই নিখুঁত।

কেবল ক্রনমিটার উদ্ভাবনের পরই এই সমস্যার সমাধান ঘটল। ঊ: ক্রনমিটার হল জাহাজের নিখুঁত ঘড়ি, যার সাহায্যে আগাগোড়া

http://allbengalibooks.blogspot.com

সমুদ্রযাত্রাকালে প্রাথমিক বা শূন্য ডিগ্রি মধ্যরেখার সময় 'বজায় রাখা' যায়। তাহলে প্রাথমিক সময় অর্থাৎ গ্রিনীচ সময় ও স্থানীয় সময়ের মধ্যকার ব্যবধান দিয়ে ক্যাপ্টেনের পক্ষে দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণ করা সম্ভব। আর স্থানীয় সময়, অন্তত মধ্যাহ্নে তো বটেই, লোকে স্মরণাতীতকাল থেকে এবং ভূমণ্ডলের যে কোন জায়গায় বার করতে জানত।

স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করা একটা আংশিক সমস্যা। কিন্তু সামগ্রিক সমস্যার সমাধান—গোলাকার ভূপৃষ্ঠকে সমতল মানচিত্রে ফুটিয়ে তোলা কী ভাবে সম্ভব? কাগজের ওপরে কী ভাবে আঁকা যায় ভূমণ্ডলের হুবহু মানচিত্র?

একটা বেলুন বা বল-এর আবরণ সমতল টেবিলের ওপর বিছানোর চেষ্টা করেই দেখ না। আর হ্যাঁ, এমনভাবে বিছাতে হবে যাতে পুরোপুরি গায়ে গায়ে টেবিলের সমতলে আঁটসাঁট হয়ে লেপ্টে থাকে। অনেক রকম কসরত করার পর তোমরা এই সিদ্ধান্তে আসবে যে এর উপায় একটাই—গোল আবরণটাকে কয়েক খন্ড করে কাটতে হবে। আর এই খণ্ডগুলো যত সরু হবে তত ভালো করে টেবিলের গায়ে লাগবে।

কিন্তু সিমাইয়ের মতন অমন ফালা ফালা মানচিত্র দিয়ে কার কী হবে? ওটা কিসের কাজে লাগবে? অথচ অমন মানচিত্র ছিল। যেন কোন গোলক থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে, এই ধরনের ফালি ফালি গোঁজের ওপর সেই মানচিত্র আঁকা। ভূপৃষ্ঠ ফুটিয়ে তোলার অন্যান্য উপায়ও চেষ্টা করে দেখা হয়। দেখতে দেখতে সৃষ্ট হল ভৌগোলিক মানচিত্র সংক্রান্ত এক আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান–মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা। আর যেহেতু সমতলক্ষেত্রে গোলকের পিঠের প্রতিরূপ কোনমতেই আনা সম্ভব নয় সেই হেতু বিজ্ঞানীরা মানচিত্রের নানা ধরনের অসংখ্য অভিক্ষেপ ভেবে বার করলেন। সেগুলোর কোন কোনটিতে বিষুবরেখার মাঝখান বরাবর দৈর্ঘ্য বজায় রইল, কিন্তু রেখাগুলো সেখান থেকে দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৈর্ঘ্যেরও বিকৃতি ঘটতে লাগল। কতকগুলোতে দ্রাঘিমা বরাবর দৈর্ঘ্য ঠিকই রইল, কিন্তু মহাদেশগুলোর আকার ও আয়তনের বিকৃতি ঘটল। আবার কোন কোনটিতে মানচিত্রে মহাদেশগুলোর আয়তন যাতে তাদের বাস্তব মূল্যের সমানুপাতিক হয়ে প্রকাশ পায় সে চেষ্টাও করা হয়। কোন কোনটিতে বা...কিন্তু এরকম আরও অনেক অনেক উল্লেখ করা যায়।

http://allbengalibooks.blogspot.com

আমাদের ছবিগুলোতে এই রকম কয়েকটি ভৌগোলিক অভিক্ষেপের পরিচয় পাবে। মন দিয়ে দেখ। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো ভবিষ্যতে জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে, তখন কিন্তু এগুলোর কোন একটার কথা তাকে মনে করতে হবে। একটাই বা বলি কেন, হয়তো বা একাধিকই।

মানচিত্র থেকে ভূগোলক

অনেক অনেক আগে, খ্রীস্টজন্মের দেড়শো বছর আগে প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত মালুসের দার্শনিক ক্রাটেস গোলকের আকারে পৃথিবীর এক প্রতিরূপ তৈরি করেন। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের অনুগামী এবং তাঁর একজন প্রশিষ্য। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিরূপটি রক্ষা পায়নি। কিন্তু যাঁরা ওটা দেখেছিলেন তাঁরা বলেন যে ক্রাটেস গোলকের গায়ে একটিমাত্র স্থলভাগ এঁকে নদনদীর প্রবাহ দিয়ে সেটাকে কতকগুলো ভাগে ভাগ করেন। ঐ নদনদীগুলোকে তিনি উল্লেখ করেন মহাসাগর নামে।

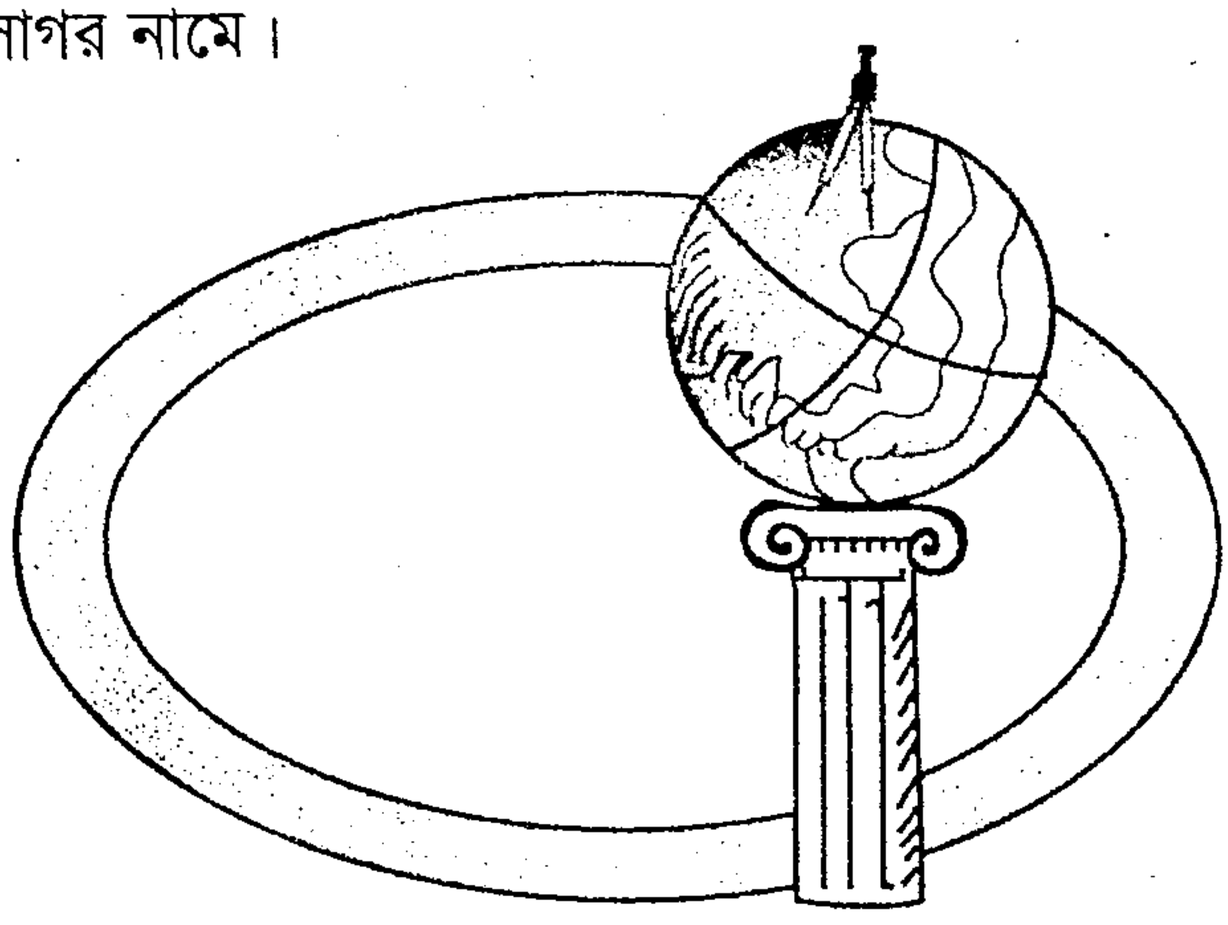

এই প্রতিরূপটিকে আজ অবশ্য সত্যিকারের ভূগোলক বলা কঠিন। অর্থাৎ, সেই সময়কার মানুষের পরিচিত সমস্ত মহাদেশ আর সাগর-মহাসাগর সমেত পৃথিবীর হুবহু প্রতিরূপ একে বলা যায় না। এটা সম্ভবত ছিল পৃথিবীর প্রতীকমাত্র। যদিও পরবর্তীকালে লোকে আবার চেপ্টা পৃথিবীর তত্ত্বে ফিরে যায় তবু রোমক ও বাইজানটাইন সম্রাটরা জগতের উপর রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ক্রাটেসের ঐ সাগর-মহাসাগর বিদীর্ণ ভূখণ্ড-আঁকা গোলক প্রথম গ্রহণ করেন। কেবল পৌত্তলি

http://allbengalibooks.blogspot.com

রোমকদের বেলায় গোলকের মাথার ওপর শোভা পেত বিজয়লক্ষ্মীর মূর্তি আর বাইজানটাইন খ্রীস্টানদের বেলায়-ক্রুশচিহ্ন। এর পর থেকে এই প্রতীকটি রাজকীয় ক্ষমতার অপরিহার্য চিহ্নরূপে পরিগণিত হয়। এখন এই রাজচিহ্নগুলো বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় মিউজিয়মগুলোতে শিল্পনিদর্শন ও মহামূল্যবান সামগ্রীরূপে সংরক্ষিত হয়ে আসছে, কেননা সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এগুলো সোনা দিয়ে তৈরি করেন, দামী পাথরে অলঙ্কৃত করেন।

উঃ প্রথম খাঁটি গোলকের আবির্ভাব ঘটে ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। একবার প্রাচীন জার্মান শহর নুরেনবার্গে স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ীর ছেলে মার্টিন বেহাইম তাঁর বাবাকে দেখতে এলেন। বাপমায়ের বড় দুঃখ এই যে ছেলে তার বাপের ব্যবসায় গেল না। কোথায় নিশ্চিন্তে মার্টিন রাজি হয়ে গেলেন। এক ফুট আট ইঞ্চি ব্যাসের একটি কাঠের গোলক বানিয়ে তার ওপর তুলট কাগজ লাগিয়ে আনতে বললেন। তারপর তিনি যা যা দেখেছেন এবং শুনেছেন সে সমস্তই ওটার ওপর এঁকে ছবিগুলোর নীচে কিছু কিছু লেখাও লিখে দিলেন। এ কাজটা না করলেই বোধহয় ভালো করতেন! ভূগোলকের ওপরে কালো ও লাল কালিতে এত বেশি আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হয়েছে যে কিছুকাল বাদে দেখা গেল নুরেনবার্গের লোকেরাই আর ঐ উপহার নিয়ে গর্ব করছে না, বরং জনসমক্ষে ওটা দেখাতে লজ্জাই পাচ্ছে। সর্বজনবিদিত জায়গাগুলোর অক্ষাংশের ক্ষেত্রে মার্টিন বেহাইমের গোলকে এমন সমস্ত ভুল ছিল যা অতি সাধারণ মানচিত্রেও দেখা যায় না। আর দূর দূর দেশগুলো যে ভাবে দেখানো হয়েছিল তাতে মানচিত্রটাকে একেবারেই ছেঁদো বলতে হয়।

যেমন, যেখানে আমেরিকা থাকার কথা সেই জায়গায় মার্টিন বেহাইম পুরো একটা দ্বীপপুঞ্জ এঁকে লিখে রেখেছেন যে সেখানে অতি বিশাল বিশাল দৈত্যাকার লোকজনের বাস-তাদের প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের চেয়ে দৈর্ঘ্যে চারগুণ এমন কি পাঁচগুণ বড়। এরা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের বিরাট বিরাট লম্বা লম্বা কান, চওড়া মুখবিবর, বড় বড় ভয়ঙ্কর চোখ, আর তাদের হাত যে কোন লোকের হাতের চেয়ে চারগুণ বড়।

যবদ্বীপে লেজওয়ালা লোকজনের বাস বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। জাপানে, যাকে তিনি জিপাংগো দেশ বলেছেন সেখানে, তাঁর বিবরণ

http://allbengalibooks.blogspot.com

অনুযায়ী, বহু সমুদ্রদানব, সমুদ্রডাকিনী ও বিকটধরনের সমস্ত মাছের বাস।

কিন্তু তাহলে কী হবে, ভূমণ্ডলীয় আপেল নামে পরিচিত তার ভূগোলকে রঙচঙের খুবই ঘটা ছিল। প্রতিটি রাজ্যে আঁকা ছিল সিংহাসনারূঢ় নৃপতি, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রঙবেরঙের প্রতীকচিহ্ন, উড়ছে পতাকা। দক্ষিণ গোলার্ধ সেকালে পর্যটকদের কাছে অপরিচিত ছিল বললেই চলে। ঐ গোলার্ধের গায়ে মার্টিন তাঁর গোলক সৃষ্টির ইতিহাস লিখে রেখেছেন।

মার্টিন বেহাইমের পর অন্যান্য দেশেও অসংখ্য ভূগোলক তৈরি হয়। সেগুলো ছিল ব্যয়বহুল, বিশালাকার, তাদের সাহায্যে পথ খুঁজে পাওয়াও সুবিধাজনক নয়। তবে হ্যাঁ, নাবিকদের নৌবিদ্যা শিক্ষার পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কিছু ভাবা যায় না। এই কারণে বহু কারিগর ভূমণ্ডলের নতুন নতুন প্রতিরূপ গড়ার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। সেগুলোর মধ্যে অনন্যসাধারণও কিছু ছিল। এই রকম একটি ভূগোলকের কাহিনীই আমি তোমাদের বলতে চাই।

একটি ভূগোলকের কাহিনী

উ: সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদে নেভা নদীর তীরে মিনারসমেত একটি প্রাচীন দালান আছে। এটা হল প্রথম রুশ মিউজিয়ম। এখানে, মিনারের পাঁচতলায় সংরক্ষিত আছে এক বিশাল ভূগোলক। এরই যে বিশদ ইতিহাস লেনিনগ্রাদের বিজ্ঞানী, অধ্যাপক রুডলফ ইটস দিয়েছেন, তা তোমাদের বলতে চাই।

১৭১৩ সালের শরৎকালের এক সন্ধ্যায় জার্মান ডিউক-রাজ্য শ্লেসভিগহলস্টিনের হটর্প দুর্গের জানলাগুলো উজ্জ্বল আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। শ্লেই নদীর মধ্যবর্তী দ্বীপে নির্মিত এই দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গটি সুইডিশ সেনাবাহিনী অবরোধ করে। ডিউক-রাজ্যের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে রুশ সেনাবাহিনী। অবরুদ্ধদের সঙ্গে মিলে তারা সুইডদের বিতাড়ন করল। এই উপলক্ষে নাবালক ডিউকের অভিভাবক এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন। চতুর রাজপ্রতিনিধিটি জানতেন যে রুশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেটও

http://allbengalibooks.blogspot.com

ছিলেন।

নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য জিনিসের প্রতি পিটারের প্রবল আগ্রহ আছে জেনে ডিউকের অভিভাবক তাঁকে একের পর এক হলঘর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সংগ্রহ দেখাতে লাগলেন। জার এই সব দেখে অবাক হয়ে গেলেও কোথাও না থেমে দ্রুত পা চালিয়ে চললেন। কিন্তু হঠাৎ একটা জিনিস দেখে তিনি থমকে গেলেন। আধা অন্ধকার বড় ঘরের মধ্যে দাঁড় করানো আছে এক বিশাল ভূগোলক, তিন মিটারেরও বেশি তার ব্যাস। গোলকটা কাঠের তৈরি, তার গায়ে কাগজ লাগানো। কাগজের ওপর নানা রঙে আঁকা রয়েছে তৎকালীন ইউরোপে পরিচিত সমস্ত দ্বীপ আর মহাদেশ।

পিটার আরও অবাক হয়ে গেলেন যখন গৃহস্বামী পাশের একটা ছোট্ট দরজা খুলে অতিথিকে গোলকের ভেতরে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে ছিল একটা টেবিল, টেবিলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে গোলকের অক্ষদণ্ড, আর চারপাশ ঘিরে একটা বেঞ্চি। লাল টকটকে রঙ লাগানো দেয়ালের গায়ে পেরেক দিয়ে আঁটা ছিল তামার তৈরি তারা।

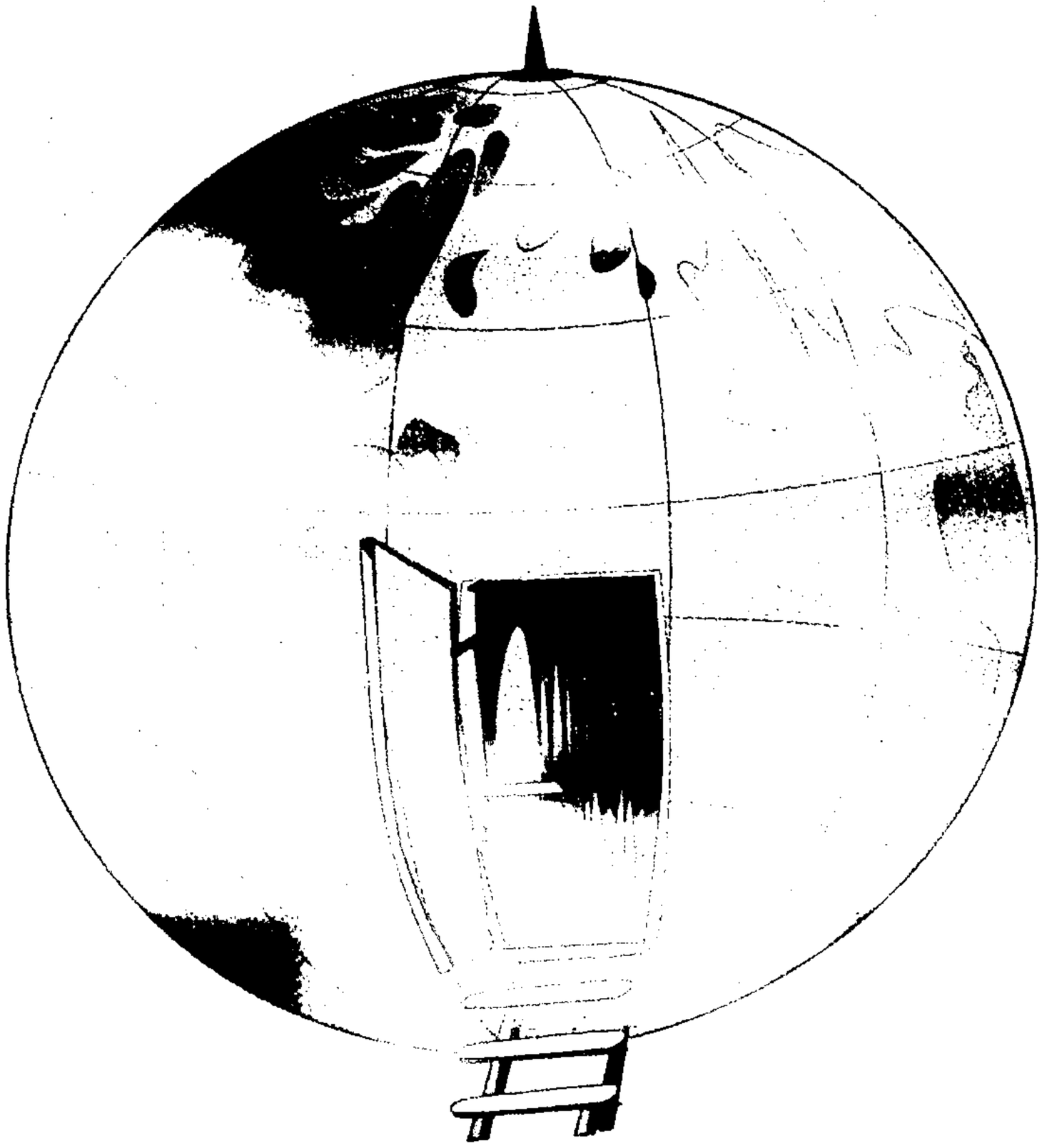

http://allbengalibooks.blogspot.com

গোলকটা জারের খুবই মনে ধরল। আর যখন রাজপ্রতিনিধির ইঙ্গিতে গোটা মেশিনটা পৃথিবীর মতো ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল তখন পিটার একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। দেশে এর সাহায্যে রুশ নাবিকদের নৌবিদ্যা শেখানোর জন্য এই আশ্চর্য জিনিসটা পেতে বড় ইচ্ছে হল তাঁর। আর এই কারণে কয়েক দিন বাদে সুইডিশ অবরোধের কবল থেকে রাজ্য উদ্ধারের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গোলকটা উপহার পেয়ে তিনি যে কী খুশিই হয়েছিলেন তা তোমরা বুঝতে পারছ।

শুরু হয়ে গেল রুশদেশের রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গের উদ্দেশ্যে জার্মান আশ্চর্যের দীর্ঘ ও কঠিন পথযাত্রা। সময় লাগল চার বছর। প্রথমে গোলকটা সমুদ্রপথে জাহাজে করে গেল, তারপর ওটাকে বিশাল স্লেজের ওপর চাপিয়ে বনজঙ্গল কেটে পথ বানিয়ে, জলাভূমি আর খাতের পাশ কাটিয়ে ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাওয়া হল। ডিউক-রাজ্যের আশ্চর্য বস্তুটি অবশেষে রাজধানীতে এসে পৌঁছুলে সেটাকে এক বিশেষভাবে তৈরি কুঠুরিতে রাখা হল।

পরবর্তীকালে একমাত্র পিটারের মৃত্যুর পরই যাদুঘর তৈরি হলে তার মিনারে ভূগোলকটি রাখা হয়। বিশ বছর পরে বড় রকমের অগ্নিকাণ্ডের ফলে যাদুঘরের সংগ্রহের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নষ্ট হয়ে যায়। জার্মান গোলকটিও আগুনে পুড়ে যায়।

বহুকাল এমন কোন লোকের সন্ধান পাওয়া গেল না যে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ঐ আশ্চর্য বস্তুটার সংস্কার করতে পারে। সংস্কার করতে সমর্থ হলেন রুশ কারিগর তিরিউতিন। কিছু সংখ্যক সহকারীর সাহায্যে তিনি গড়ে তুললেন একটা নতুন কাঠামো, ঘোরানোর যন্ত্রব্যবস্থা মেরামত করলেন, তার উৎকর্ষসাধন করলেন। হলুদ রঙের তামার দুটি পাত দিয়ে বিষুবরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মতন করে গোলকটাকে বেড় দিলেন। তারপর ডাকা হল অঙ্কনশিল্পীদের। এখানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হল, কেননা গত একশো বছরে পৃথিবীতে বেশ কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে, সংশোধিত হয়েছে, যুক্ত হয়েছে।

ভেতরের দেয়ালে লাগানো হল আশমানি রঙ। নক্ষত্রপুঞ্জের রূপকধর্মী ছবি আঁকা হল, আঁটা হল সোনালি তারা দেয়া পেরেক। বেশ হল দেখতে–পুরনোটার থেকেও ভালো।

http://allbengalibooks.blogspot.com

১৯০১ সালে ভূগোলকটা নিয়ে আসা হল তসারস্কোয়ে সেলোতে (বর্তমানে পুশকিন শহর)। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪১–১৯৪৫) শহর সাময়িকভাবে ফাশিস্ত বাহিনী দখল করে ফেলে। সোভিয়েত সৈন্যরা যখন দখলদারদের কবল থেকে পুশকিন শহর উদ্ধার করে তখন না ভূগোলক, না তার ধ্বংসাবশেষ কিছুরই সন্ধান পাওয়া গেল না। বহু খোঁজাখুঁজির পর তার সন্ধান পাওয়া গেল জার্মানির লিউবেক শহরে–ফাশিস্তরা ওটা ওখানে নিয়ে গিয়েছিল।

দুশো বছর আগে যেমন হয়েছিল এবারেও তেমনি গোলকটা–এখন অবশ্য তিরিউতিনের গোলক–জাহাজে চাপানো হল। আর্খানগেলস্ক বন্দরে তার জন্য তৈরি হল এক বিশেষ ধরনের রেলওয়ে পাটাতন, তাতে চেপে আমাদের দায়ে-পড়ে ভ্রমণকারী ভূগোলক ফিরে এলো লেনিনগ্রাদে।

১৯৪৮ সালে যাদুঘরের মিনারের দেয়ালে একটা বিশেষ ধরনের গর্ত করা হল। রুশ কারিগরের তৈরি এই বিশাল ভূগোলকটি ক্রেনের সাহায্যে গিয়ে উঠল পাঁচতলায়। আজও ওটা ওখানেই আছে।

লেনিনগ্রাদে যাবার সুযোগ যদি তোমাদের হয়, তাহলে যাদুঘরে গিয়ে এই পর্যটক ভূগোলকটিকে একবার দেখার অবশ্যই চেষ্টা করবে। আফশোস করতে হবে না!

পৃথিবীর আয়তন

সুপ্রাচীকাল থেকে পৃথিবীর আকার ও আয়তন জানার জন্য মানুষের আগ্রহ।

এরাতোস্থেনাসের পর বহু পণ্ডিত তাঁর পন্থায় চেষ্টা চালালেন। কিন্তু তাঁদের ফল বেরোল নানা রকমের। রোড্‌স দ্বীপ আর আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে জাহাজ যেতে কত দিন লাগে তার হিসাব নিয়ে এবং রাতের আকাশে অগস্ত্য তারা কতটা উঁচুতে থাকে তা নির্ণয় করার পর প্রাচীন গ্রীসের জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ পসিডোনিয়াসও পৃথিবীর পরিধি নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাঁর ফল এরাতোস্থেনাসের চেয়ে কম নিখুঁত হল।

তারপর প্রায় হাজার বছর কেটে গেল। নবম শতাব্দীতে খলিফা আল্-মামুনের নির্দেশে আরবীয় পণ্ডিতরা আমাদের গ্রহ পরিমাপ করেন।

http://allbengalibooks.blogspot.com

তাঁরা কাজ করেন মেসোপোটামিয়ায়, কিন্তু তাঁদের হিসাবের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের আরও কিছু কিছু চেষ্টা করা হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক ফরাসী চিকিৎসক তাঁর গাড়ির চাকায় ঘূর্ণন গণনার একটি যন্ত্র লাগিয়ে প্যারিস থেকে আমিয়েনস শহরে যাত্রা করলেন। পথের শুরুতে এবং যাত্রাশেষে তিনি কাঠের ত্রিকোণের সাহায্যে সূর্য কতটা উঁচুতে আছে তা খুঁটিয়ে দেখে তাই দিয়ে পৃথিবীর পরিধি মাপার চেষ্টা করেন। কিন্তু পথ উঁচু-নীচু এবং আকাশে সূর্য কতটা উঁচুতে আছে তা পরিমাপের পদ্ধতিও স্থূল হওয়ায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। পরিমাপের অন্য কোন পদ্ধতি বার করার প্রয়োজন দেখা দিল। পদ্ধতিটা হতে হবে এমন যাতে জমি উঁচু-নীচু হলেও কোন ব্যাঘাত না হয়।

আরও প্রায় একশো বছর পরে উইলেব্রড স্নেল্ নামে জনৈক ওলন্দাজ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ অনুরূপ একটি পদ্ধতি দেখান। পদ্ধতিটির নাম তিনি দেন 'ট্রায়াংগুলেশন'—লাতিন ভাষার শব্দ 'ট্রায়াংগুলিয়ম' অর্থাৎ ত্রিকোণ থেকে এর বুৎপত্তি। ওপরের ক্লাসে উঠে তোমরা যখন ত্রিকোণমিতি পড়বে তখন অবশ্যই জানতে পারবে ত্রিকোণের সাহায্যে কী ভাবে ঐরকম পরিমাপ করা যায়। ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলজনক।

বিভিন্ন দেশে দৈর্ঘ্য পরিমাপ ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাতেও বিজ্ঞানীদের কাজে কম ব্যাঘাত ঘটত না। যেমন, ফরাসী দেশে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য পরিমাপের মাত্রা ছিল তুয়াজ—ছয় ফুটের সমান।

ঐ একই সময় ইংলন্ডে প্রচলিত ছিল গজ—তিন ফুটের সমান। আর রাশিয়ায় সাজেন—ইংলন্ডীয় সাত ফুট।

আবার ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত জার্মানিতে ফুটের আয়তনই হত একেক রাজ্যে একেক রকমের। এছাড়া আবার ছিল মাইল—ইংলন্ডীয় ও মার্কিন, সামুদ্রিক মাইল ও স্থলসীমা মাপার মাইল, ছিল রুশী ভার্স্ট।

এসব মিলেমিশে এমন একটা জট পাকিয়ে তুলত যে সবগুলো ব্যবস্থার বদলে একটা সাধারণ ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে দেখা দিল। ফরাসীরা পৃথিবীর মধ্যরেখার এক-চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের

http://allbengalibooks.blogspot.com

এক ভাগকে দৈর্ঘ্য পরিমাপের মাত্রা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব দিল। ফরাসীদেশের জাতীয় পরিষদ এই প্রস্তাব আইনে পরিণত করল। নতুন মাত্রার নাম হল মিটার।

কমলালেবু না আপেল—কিসের মতো পৃথিবী?

উ: কমলালেবুর সঙ্গে আপেলের তফাৎটা কোথায় তোমরা কি জান? স্বাদের কথা অবশ্য বলছি না, বলছি আকারের কথা। কমলালেবু সামনে আর পেছনের দিকে খানিকটা টানা, লম্বাটে, আর আপেল ঐ দুদিকেই একটু চাপা। এসো, এরকমই ধরা যাক, যদিও প্রকৃতিতে নানা আকারের কমলালেবু এবং আপেলও দেখা যায়।

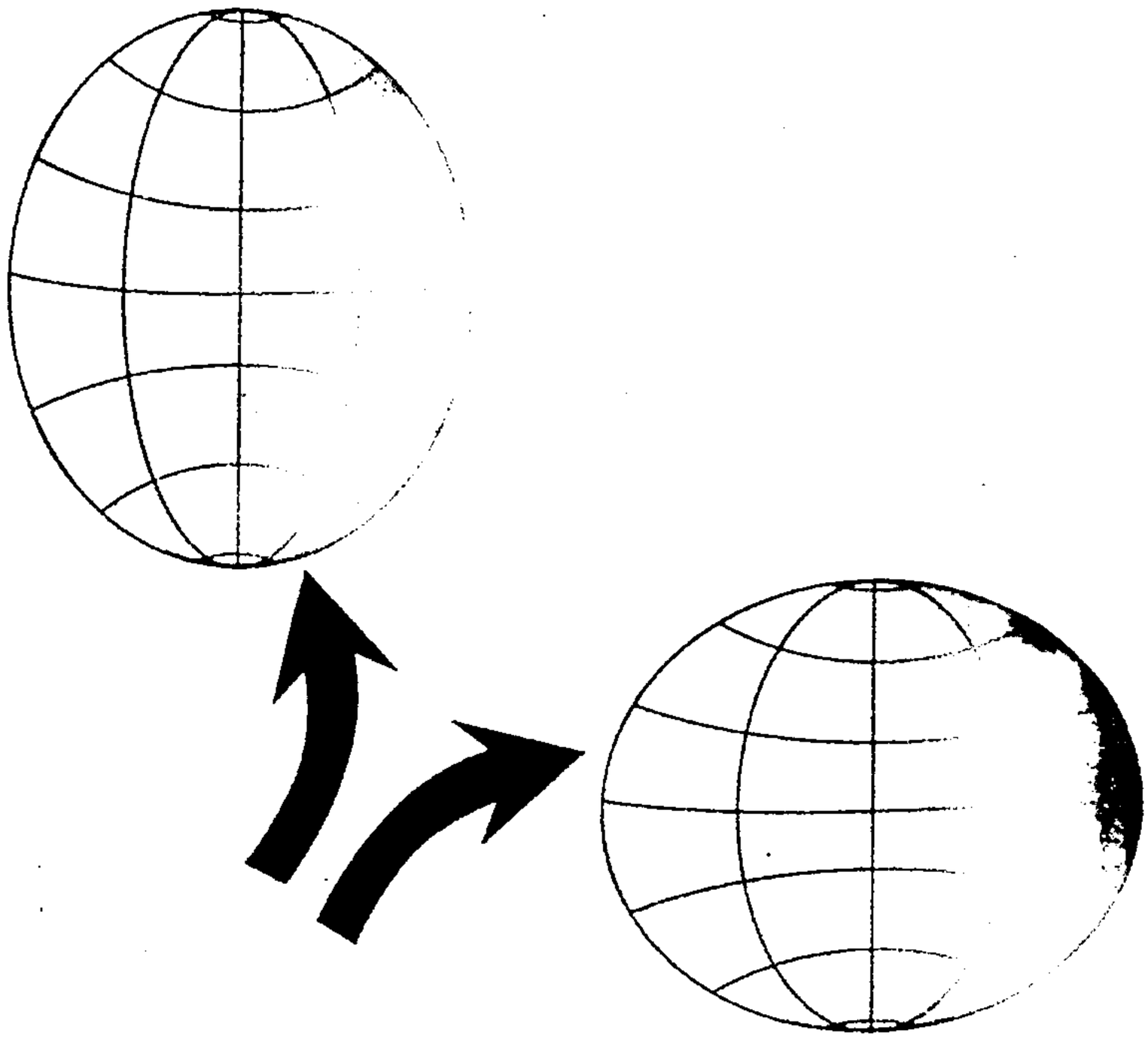

পৃথিবীর যে একটা আদর্শ গোলক সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু পরে হঠাৎ দেখা গেল সন্দেহ। পৃথিবীর বিভিন্ন বিন্দুতে দ্রাঘিমার ধনুরেখাগুলোর দৈর্ঘ্য পরিমাপের পর প্যারিসের বিজ্ঞান আকাডেমি এই সিদ্ধান্তে এলো যে আমাদের গ্রহ দুই মেরুর দিকে সামান্য টানা, লম্বাটে। অর্থাৎ পৃথিবীর

http://allbengalibooks.blogspot.com

আকার কমলালেবুর মতো। এখান থেকে এর সূত্রপাত।

ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন এটা মানলেন না। তাঁর হিসাব মতে পৃথিবীর দুই মেরুর প্রান্ত লম্বাটে নয়, বরং চাপা। নিউটনকে সমর্থন করলেন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী খ্রিস্টিয়ান হিউইগেনস। তিনি বললেন পৃথিবী যখন তার অক্ষদণ্ডের চারপাশে ঘোরে তখন তাকে চাপা হতেই হবে। এর সমর্থনে তিনি দেখালেন নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি: একটা কাঠির ডগায় বড় এক তাল কাঁচা মাটি বসিয়ে অক্ষদণ্ডের ওপরে সেটাকে জোরে ঘোরাতে লাগলেন। নরম মাটির ঢেলা খানিকটা চেপ্‌টে গিয়ে গোলক থেকে যে আকারে পরিণত হল তা অনেকটা আপেলের মতো দেখতে।

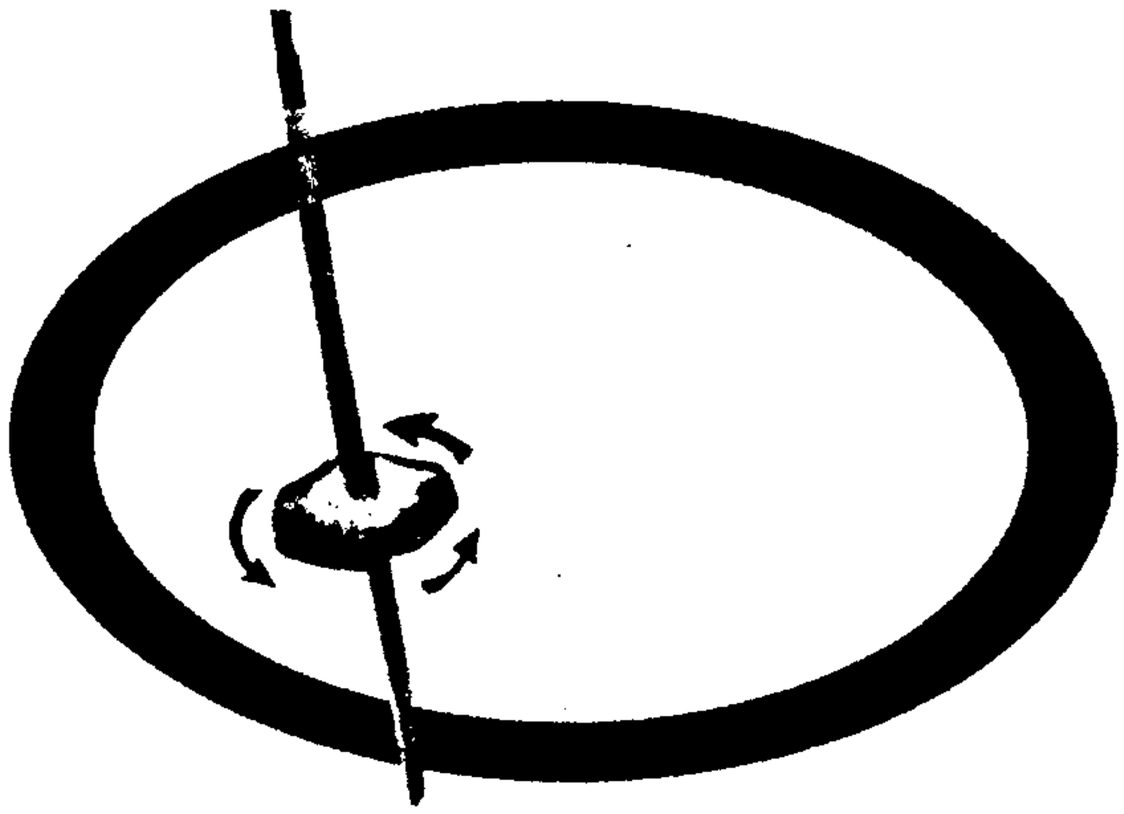

বিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্কবিতর্কের ঝড় উঠল। ফরাসীরা জোর দিয়ে বলে চললেন, 'পৃথিবীর দুই মেরুপ্রান্ত লম্বাটে!' 'চেপ্‌টা, চেপ্‌টা...' এর জবাবে বললেন ইংরেজরা। এই বাদানুবাদ মীমাংসার জন্য পাঠাতে হল নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক অভিযান, পরিমাপ করে দেখতে হল মধ্যরেখাগুলো। নতুন নতুন গবেষণাকর্মের ফলে কালে প্রমাণিত হল যে পৃথিবী বাস্তবিকই উত্তর-দক্ষিণে খানিকটা চেপ্‌টা, যদিও ঠিক সমানভাবে নয়।

পৃথিবীর আকার যে ঠিক কী রকম তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হল আমাদের এই কালে। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হল পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। মহাকাশের ব্যবহারিক চর্চার কাল শুরু হল।

প্রথম পরীক্ষার পর একের পর এক যাত্রা করতে লাগল সোভিয়েত বাহক-রকেট। নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের বাহক ইউনিটগুলোতে বন্যাস্রোতের মতো

http://allbengalibooks.blogspot.com

তথ্য আসতে শুরু করল।

এক বছর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কক্ষপথে পাঠাল তাদের কৃত্রিম উপগ্রহ।

সমান উপবৃত্তাকার কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর এই যাত্রা পর্যবেক্ষণ করার পরই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে উত্তর গোলার্ধের ওপর দিয়ে যাবার সময় মহাকাশযানগুলো তাদের কক্ষপথ নীচু করে যেন 'ডুব দেয়'। মনে হয় এখানে কোন একটা কিছু তাদের আকর্ষণ করে, অথচ দক্ষিণ গোলার্ধের ওপর দিয়ে যাত্রার সময় কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কী হতে পারে?

http://allbengalibooks.blogspot.com

কম্পিউটার যন্ত্র হিসাবের কাজে লেগে গেল, ইতিমধ্যে দুই মহাদেশ থেকে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল কৃত্রিম উপগ্রহ, তথ্যাদি জমতে লাগল। শেষ পর্যন্ত উত্তর পাওয়া গেল! পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকে–ভারত মহাসাগর অঞ্চল ও উত্তর আমেরিকার উপকূলভাগের অদূরে কৃত্রিম উপগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণ স্ফীতি দেখতে পেল। অনেক মাপজোখের পর দেখা গেল আমাদের গ্রহ উত্তর গোলার্ধে সামান্য লম্বাটে আর দক্ষিণ গোলার্ধে খানিকটা চাপা–অনেকটা নাশপাতির মতো তার আকার। তবে বইতে যেমন আঁকা হয়ে থাকে সে রকম মসৃণ সুন্দর আর মোলায়েম নয়, এবড়োথেবড়ো, ক্ষতবিক্ষত তার গা।

কিন্তু পৃথিবীকে নাশপাতির আকারের আখ্যা দিয়েও ছেড়ে দেয়া চলে না। তাহলে কী উপায়? এই কারণে বিজ্ঞানীরা সকলে মিলে বেছে নিলেন একটি পরিভাষা–'geoid'–ধরাকৃতি। শব্দটির উদ্ভব অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে! এই আখ্যা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটির কোন কারণ থাকতে পারে না। ভবিষ্যতে পৃথিবীর আরও যথাযথ যে ছবিই পাওয়া যাক না কেন, ধরাকৃতি–এই সংজ্ঞার মধ্যে তার সবগুলোই দিব্যি কুলিয়ে যেতে পারে।

পৃথিবী নামক গ্রহের সংক্ষিপ্ত সার

পৃথিবীর মেরুবৃত্তের ব্যাসার্ধ ৬৩,৫৬,৭৮০ মিটার, কিন্তু নিরক্ষবৃত্তের ব্যাসার্ধ ২১,৩৮০ মিটার দীর্ঘতর। একুশ কিলোমিটারের সামান্য বেশি এই বাড়তি অংশটুকু আমাদের ভূমণ্ডলের মতো একটি গোলকের ব্যাসার্ধের পক্ষে অবশ্যই সামান্য। কিন্তু তার ফলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য ৪,০০,৭৫,১৬০ মিটার পৃথিবীর মধ্যরেখার দৈর্ঘ্যের চেয়ে ১,৩৪,৩৩৪ মিটার বেশি হয়ে যাচ্ছে। আর একশো চৌত্রিশ কিলোমিটার–যাই বল না কেন খুব একটা কম দূরত্ব নয়।

আজ আমাদের গ্রহের আকার ও আয়তন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের আমরা যথাযথ উত্তর দিতে পারি। 'পৃথিবীতে জলভাগ না স্থলভাগ কোনটা বেশি?' প্রাচীন ভৌগোলিকদের এই বাদ-প্রতিবাদেরও আমরা উত্তর দিতে পারি। যারা যথাযথ পরিসংখ্যান চায় তাদের জন্য বলতে পারি: পৃথিবীতে সাগর-মহাসাগর আছে ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের। এই আয়তন সমগ্র ভূপৃষ্ঠের ৭০.৮ শতাংশ।

http://allbengalibooks.blogspot.com

তার মানে স্থলভাগ দাঁড়াচ্ছে মোটে ২৯.২ শতাংশ।

এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির বাস। তাই এখন মানুষের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের পৃথিবীর কল্যাণ, আর এই কারণেই তোমার আমার কাজ হল পৃথিবীকে রক্ষা করা, পৃথিবীর সুখ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা।

পৃথিবীর আকার সন্ধান ও নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষকে যে কত দীর্ঘ পথযাত্রা করতে হয়েছে তা এখন তোমরা দেখলে তো!

http://allbengalibooks.blogspot.com

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–২

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মধ্যযুগের দুঃসাহসী ভ্রমণকারীরূপে আমরা কাদের দেখতে পাই?
২. কীভাবে পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল?
৩. রূপো না কাগজ–কোনটা বেশি টেকসই?
৪. ঘরকুনোদের পরিচয় দাও?
৫. প্রথম আমলে দূর সমুদ্র যাত্রার অবস্থান নির্ণয় করা হত কি দিয়ে?
৬. প্রথম খাঁটি গোলকের আবির্ভাব ঘটে কত শতাব্দীতে?

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১. কত শতাব্দীতে কারা প্রথম আফ্রিকার দেশগুলোর বিবরণ ইউরোপীয়দের নিকট তুলে ধরেন?

২. ভাবনা আর জ্ঞান আশ্চর্য জিনিস বটে!–রূপকথার সেই টাকার মতো–যতই খরচ করা হোক না কেন এর কোন শেষ নেই–কথাটির ব্যাখ্যা দাও।

৩. কীভাবে চিরতরে প্রমাণিত হলো যে পৃথিবী গোল?

৪. একটি ভূগোলকের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর বর্ণনা দাও?

৫. ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক ফরাসী কীভাবে পৃথিবীর পরিধি মাপার চেষ্টা করেন?

৬. কমলালেবু না আপেল–কিসের মতো পৃথিবী–ব্যাখ্যা দাও?

http://allbengalibooks.blogspot.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবেশ বিজ্ঞান

পাঠ – ১.৩

- পরিবেশ বলতে আমরা কি বুঝি? কীভাবে পরিবেশ দূষিত হয়।
- মাটি দূষণ, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ কীভাবে হয়ে থাকে? এগুলো রোধের উপায় কি?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে তোমরা আরও জানতে পারবে–

❖ পরিবেশ ও প্রতিবেশের সংজ্ঞা।

❖ খাদ্যচক্রের বর্ণনা।

❖ পাহাড় কেমন করে হল? হিমালয় পর্বতমালা।

❖ প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রকৃতির অবস্থা। বজ্রঝড়, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, টর্ণেডো ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা।

❖ জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, হারিকেন, টাইফুন।

❖ ঘূর্ণিঝড় ও বাংলাদেশ

❖ বন্যা, নদীভাঙন, ভূমিধস, খরা, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

http://allbengalibooks.blogspot.com

পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ

উ: আমাদের চারপাশের জগতের সব রকমের জড় ও জীবকে নিয়ে গড়ে উঠেছে পরিবেশ। এই জীব ও জড়ের মধ্যে রয়েছে প্রতিদিনের সম্পর্ক এবং এ সম্পর্কের কারণে আমাদের চারপাশে ঘটছে বিচিত্র সব কর্মকাণ্ড। অনেক সময় এ কর্মকাণ্ড যখন স্বাভাবিক নিয়মে চলতে পারে না তখন দেখা দেয় পরিবেশের সঙ্কট। আসলে এই সঙ্কটের বেশির ভাগ সৃষ্টি করে মানুষই– তাদের নানা কর্মকাণ্ড পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা হুমকির মুখোমুখি হয়। আর একেই আমরা বলি পরিবেশ দূষণ।

'দোষ' কথাটি থেকেই এসেছে দূষণ। সাধারণভাবে বলা যায় যে, জীবজগতে যখন জীবের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় তখন তারা এমন সব কাজ করে যা তার চারপাশের জগতকে স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দেয় না। মানুষের কথাই আগে বলা যাক। একটি দেশের মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে চলে তখন তারা নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

বাড়তি মানুষের জন্য বাড়তি খাবারের যোগান দিতে তারা উচ্চ ফলনশীল শস্যের আবাদ করে। উচ্চ ফলনশীল শস্যের হাত ধরে আসে রাসায়নিক সার, বিষাক্ত কীটনাশক, কৃত্রিম বীজ এবং আরও কত কি? চাষের জমি বাড়াতে ও বসতবাড়ি তৈরি করতে কাটতে হয় বন আর তাতে হুমকির মুখোমুখি হয় বন্য প্রাণী। বায়ুমণ্ডলে বেড়ে যায় কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওজোন স্তর এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যায় বেড়ে। বাড়তি মানুষের প্রয়োজন কেবল খাদ্য নয়, তাদের জন্য পণ্যসামগ্রীর সরবরাহও বাড়াতে হয়, ফলে গড়ে ওঠে শিল্প-কারখানা, ইঞ্জিন-চালিত নানা যানবাহন। এসব কল-কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া দূষিত করে পরিবেশ।

উ: পরিবেশ দূষণকে আমরা চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। এগুলো হচ্ছে–মাটি দূষণ, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ। মাটি জীবনকে ধারণ, লালন ও বিকশিত করে। কেবল উদ্ভিদ নয়, মানুষ ও আর সব প্রাণীও জীবনের লালন ও বিকাশে মাটির ওপর নির্ভর করে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

মাটি দূষণ

আমরা মাটির প্রতি তেমন যত্নশীল নই। মাটি আজ আমাদেরই হাতে মারাত্মক দূষণের শিকার হচ্ছে। আর এ দূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে মাটিতে বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। উ: মাটির দূষণের জন্য দায়ী হচ্ছে কঠিন ও রাসায়নিক বর্জ্য। আমরা প্রতিদিন আবর্জনা ফেলে আমাদের চারপাশেই জমিয়ে তুলছি স্তূপ। দিনে দিনে জমে ওঠা এসব আবর্জনা আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ নানা রোগের শিকার হচ্ছে। খাবারের উচ্ছিষ্ট, কাগজ, হার্ডবোর্ড, কাচের জিনিস, এলুমিনিয়াম, পলিথিন যখন এখানে সেখানে ফেলে দিই তখন একটুও ভেবে দেখি না পরে এগুলোর দশা কী হবে। কাগজ, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি কিছুদিন পরেই পচে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়।

কিন্তু কাচ, এলুমিনিয়াম ও পলিথিনের বেলায় কী ঘটে? হিসাব করে দেখা গেছে, এলুমিনিয়াম মাটির সাথে মিশে যেতে প্রায় একশো বছর সময় লাগে, কাচের লাগে দুশো বছর আর পলিথিনের সাড়ে চারশো বছরেরও বেশি। পলিথিনের যেমন খুশি ব্যবহার এখন রীতিমতো ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। মাটির উপর আস্তরণ সৃষ্টি করছে পলিথিন। অচল করে দিচ্ছে নর্দমা ও পয়ঃনিষ্কাশনের পথগুলো। সামান্য বৃষ্টি নামতেই শহরগুলোতে জমে উঠছে পানি। পানি সরতে না পারায় সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা। পলিথিন এবং অন্য সব কঠিন বর্জ্যগুলো নদী ও সাগরে গিয়েও পড়ছে। ফলে নদী ও সাগরের জীবজগৎও দারুণ বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে।

রাসায়নিক বর্জ্যও মাটির অশেষ ক্ষতি করছে। দিনে দিনে মাটি তার উৎপাদনের শক্তি হারাচ্ছে। মাটিতে যে সব প্রাণীর বাস এবং যে সব প্রাণী মাটির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে তাদের ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। মূলত কৃষি ও শিল্প থেকে যে সব রাসায়নিক বর্জ্য সৃষ্টি হচ্ছে তা মাটি দূষণের প্রধান কারণ। আমাদের দেশে কীটনাশকের ব্যবহার শুরু হয় ষাটের দশক থেকে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল বাঁচাতে এ কীটনাশকের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। কীটনাশক কেবল ক্ষতিকর কীটকে বিনাশ করছে না, বিনাশ করছে উপকারী কীটগুলোকেও। উন্নত বিশ্বে কতকগুলো কীটনাশক মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য ক্ষতিকর বলে

http://allbengalibooks.blogspot.com

নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কীটনাশকের যেমন খুশি ব্যবহারের ফলে পোকামাকড় থেকে শুরু করে সরীসৃপ এবং পাখিরাও মরছে। অথচ এদের বেশির ভাগই আমাদের উপকারী বন্ধু। কীটনাশকের পাশাপাশি আগাছানাশকও ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলের জমিতে। ক্ষতিকর আগাছা দূর করে উদ্ভিদের বাড়তি ফলনের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ আগাছানাশক সহজেই উদ্ভিদের দেহে ঢুকে যায়। এ সব উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান হয়ে ক্ষতি করে আমাদেরই।

পরিবেশের দূষকগুলোকে আলাদা করে দেখা ঠিক নয়। কারণ যে দূষক মাটিকে দূষিত করে তা পরে মিশে যাচ্ছে পানিতে ও বায়ুতে। শিল্পকারখানার বর্জ্য প্রথমে জমি এবং পরে পানিকে দূষিত করছে। কলকারখানার বিষাক্ত কালো ধোঁয়া আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেলেও বৃষ্টির পানিতে মিশে তা এসিড বৃষ্টি হয়ে মাটিতেই ফিরে আসে।

পানি দূষণ

পানি দূষণ আজকের দিনে আমাদের জন্য একটি বড় ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা মহাসাগর নামের যে বিশাল জগতের কথা বলি, সে জগতটিও আজ সমস্যার মুখোমুখি। নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পয়ঃনিষ্কাশন ও শিল্প বর্জ্য দ্রুত বেড়ে চলেছে। এসব বর্জ্য নদীতে এবং নদী থেকে সাগরে গিয়ে পড়ছে। ফলে বেলাভূমিতে ও সাগর উপকূলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বেড়ে চলেছে। নদীতে ও সাগরে চলছে যেসব জলযান তারাও দূষিত করছে পানি। এসব জলযান থেকে দূষণীয় বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে পানিতে প্যাথোজেন প্রবেশ করছে। এই প্যাথোজন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর রোগের কারণ হচ্ছে।

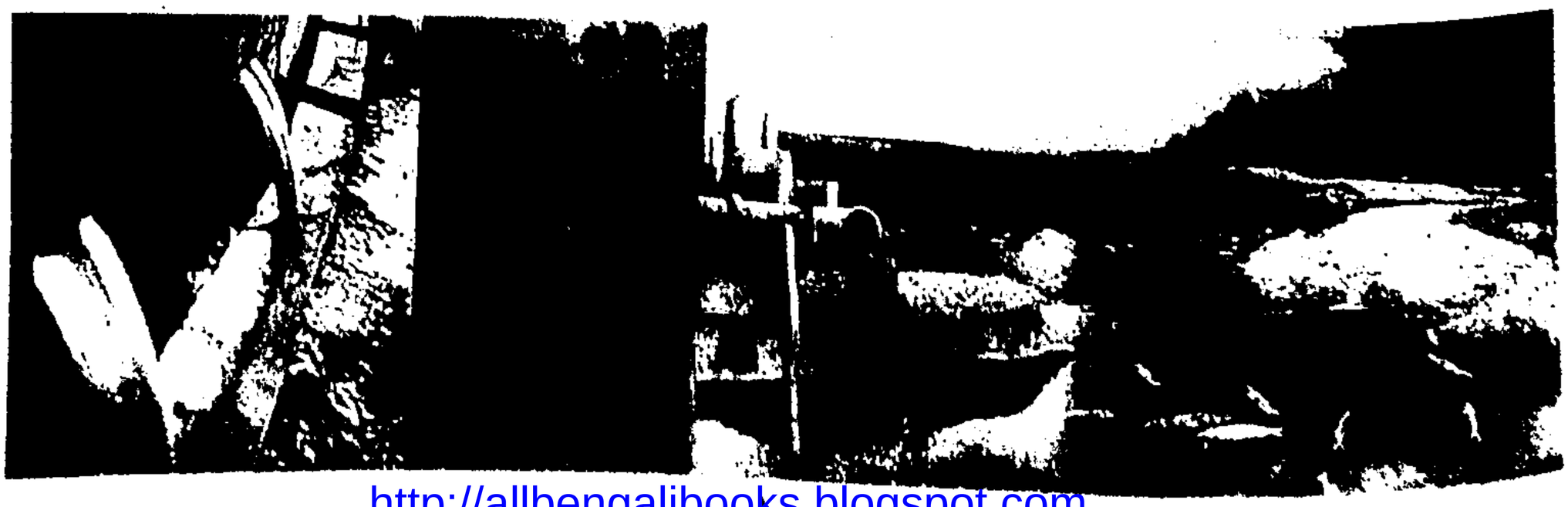

http://allbengalibooks.blogspot.com

মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখায় নীল আর নীল। আর এই নীল দেখবার অন্যতম কারণ হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে বিশাল পানির জগৎ–নদী, হ্রদ আর সাগর। আসলে ভূভাগের ৭০.৮ ভাগ জুড়ে আছে সাগর মহাসাগর, বাকি ২৯.২ ভাগ স্থল। উঃ পৃথিবীর বেশির ভাগ পানিই তিনটি মহাসাগরের দখলে রয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর। মহাসাগর বলে যাকে জানি তা আসলে উত্তর আটলান্টিকেরই বিস্তার। বিশাল তিনটি মহাসাগরই দক্ষিণ মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরো অ্যান্টার্কটিকাকে ঘিরে রেখেছে। সাগরগুলো আছে বলেই আমাদের পৃথিবীটা আর সব গ্রহ থেকে আলাদা।

এদের কারণেই এখানে জন্মেছে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল। পৃথিবীর চারপাশে যে মেঘমালায় বিস্তার তাও সম্ভব হয়েছে পৃথিবী জুড়ে পানির কারণেই।

তেলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনার কবলে পড়লে তেল ছড়িয়ে পড়ে নদী ও সাগরে। এসব তেল সাগরের পানির উপরি স্তরে ভেসে থাকে। ফলে সাগরের প্রাণিকুল, বিশেষ করে পাখিরা মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হয়। এ ছাড়া জাহাজগুলো বন্দরে ভেড়ার পরে অভ্যন্তরীণ বর্জ্য নিক্ষেপ করে বন্দরেই। এসব বর্জ্য দূষিত করছে নদী ও সাগরের পরিবেশ।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষিফলন বাড়ানোর প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সার ও কীটনাশক শেষটায় পানিতে মিশে নদী এবং নদী থেকে সাগরে গিয়ে পড়ছে। এগুলো মাটির নিচেকার পানির সঙ্গেও মিশে যাচ্ছে। এ ছাড়া মোটরযানে ব্যবহৃত তেল, ঘরবাড়িতে লাগানো পুরনো রঙের আস্তরণও চলে যায় ভূগর্ভের পানিতে। এসব বিষাক্ত বর্জ্য ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং সেই সঙ্গে নদ-নদী, গ্রহ ও সাগরের পানিকে দূষিত করছে। তাপীয় দূষণের শিকার হচ্ছে নদী ও সাগরের পানি। তাপীয় শক্তি উৎপাদনের কারণে ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে পরিবেশ। তাপীয় শক্তিস্থাপনাগুলো গরম পানি ছেড়ে দিচ্ছে নদীতে এবং হ্রদগুলোতে। এর ফলে নদী ও হ্রদের পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

গরম পানি অক্সিজেন ধরে রাখতে পারে না বলেই জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিপদ ঘটছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, পানির

http://allbengalibooks.blogspot.com

তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছলে সব রকমের মৎস্য প্রজাতি হারিয়ে যাবে। পারমাণবিক স্থাপনা পানিদূষণের বড় রকমের কারণ। এ স্থাপনাগুলো থেকে পারমাণবিক বর্জ্য নিক্ষেপ করা হচ্ছে সাগরে। ফলে সাগর-প্রতিবেশে প্রাণী ও উদ্ভিদকুল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাসায়নিক বর্জ্য ভূপৃষ্ঠের পানিদূষণের মধ্য দিয়ে খাদ্যশৃঙ্খলেও ঢুকে পড়ছে।

আমরা যে মাছ খাই তা বেঁচে থাকে জলজ উদ্ভিদ খেয়ে। এ জলজ উদ্ভিদকে সংক্রমিত করছে রাসায়নিক ও ধাতব বর্জ্য। ফলে মাছ থেকে তা মানুষের দেহেও সংক্রমিত হচ্ছে। অপর দিকে, ভূগর্ভের পানিতে যে রাসায়নিক বর্জ্য স্থান করে নেয়, মানুষ সে পানি পান করে নানা রোগের শিকার হচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অন্ত্রের ক্যান্সার, শিশুদের নিউমোনিয়ার জন্য পানির রাসায়নিক দূষণকে অনেকাংশে দায়ী মনে করছেন।

বায়ুদূষণ

আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। এ বায়ুমণ্ডল ধারণ ও পোষণ করছে জীবনকে। বায়ু আছে বলেই পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি, প্রাণী ও উদ্ভিদের বিপুল ও বিচিত্র সমারোহ। আমরা অনেকেই মনে করি, বায়ুর বিশাল ভাণ্ডারটির ক্ষতির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা যে সব গ্যাস ছেড়ে দিই তার সব কিছুই নিজের গায়ে মিশিয়ে নেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে বায়ুর। এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বায়ুর গ্রহণক্ষমতা যে সীমিত তা আমাদের চারপাশের জগতের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আমাদের বড় শহরগুলোতে অসংখ্য মোটরযান যখন ধোঁয়া ছড়ায় তখন কেমন হাঁসফাঁস করি আমরা–যেন দম আটকে গেল। এমন ধারা কিছুদিন চলবার পরেই শুরু হতে পারে রীতিমতো শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাসকষ্ট থেকে আর সব জটিল রোগ। শিল্পকারখানার কালো ধোঁয়া উঠছে অনেক উপরের আকাশে।

তারপর কোথায় গেল সে ধোঁয়া? বাতাসে ভেসে বেড়ানো সে ধোঁয়া বৃষ্টির পানিতে মিশে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকেই–বিষিয়ে দিচ্ছে বনভূমি, ঘরছাড়া করছে বনে যারা বাসা বেঁধেছে সে সব প্রাণিদের। বিষাক্ত ধোঁয়া মেশানো এ বৃষ্টির নাম এসিড বৃষ্টি।

পৃথিবীর চারপাশের বায়ুর বিশাল ভাণ্ডার দূষিত হচ্ছে আরও নানা

http://allbengalibooks.blogspot.com

কারণে। সাগর থেকে উঠে আসা লবণ, ধোঁয়ার কালো গুঁড়ো, পরাগরেণু-এ সবই ভেসে বেড়ায় বাতাসে। তবে বায়ুদূষণের একটি বড় কারণ হল মোটর গাড়ির ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া। নানা রকমের যানবাহন রোজ রোজ বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন নামের বিষাক্ত গ্যাস। এসব গ্যাস সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে মানুষের–এতে শ্বাসজনিত রোগ থেকে শুরু করে ক্যান্সার এর মতো মারাত্মক সব রোগ হতে পারে। যানবাহন ও কলকারখানাগুলো থেকে বেরিয়ে আসে কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর জ্বালানি পুরোপুরি পুড়ে যায় না বলে তা থেকে তৈরি হয় কার্বন মনোক্সাইড।

আমরা জানি, শক্তির একটি প্রধান উৎস হচ্ছে কয়লা। নাইট্রোজেন ও সালফার যৌগ উৎপন্ন হয় কয়লা পোড়ানো থেকেই। এগুলো বাতাসকে দূষিত করে। নাইট্রোজেন ও সালফার অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতায় নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিডে পরিণত হয়। শীতকালে ধোঁয়া ও কুয়াশা এক সাথে মিশে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয় তাও সূর্যের আলোতে যানবাহন থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া ও হাইড্রোকার্বন থেকেই সৃষ্টি হয়। শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুদূষণের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোতে এসিড বৃষ্টি জলজ প্রতিবেশকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এছাড়া এসিড বৃষ্টি বনভূমি বিনাশেরও কারণ হচ্ছে। শিল্পকারখানা, খনি ও যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা থেকে নির্গত সীসা, নিকেল, তামা ও লোহা মানুষের শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। বায়ু দূষণের ফলেই এ সব সমস্যা তৈরি হয়েছে।

আজকের দিনে বায়ুদূষণ ঘরে-বাইরে সর্বত্রই ঘটছে। এর মধ্যে অভ্যন্ত রীণ বায়ু দূষণ স্বাস্থ্যের জন্য রীতিমত হুমকি সৃষ্টি করছে। সিগারেটের ধোঁয়া, এসবেস্টস, র‍্যাডন, ভিনাইল ক্লোরাইড, রান্নার গ্যাস ইত্যাদি সাধারণত বসত বাড়ি থেকে শুরু করে বহুতল দালানের ভেতরের বায়ুকে দূষিত করছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া। **এখন ধারণা করা হচ্ছে, প্রতি বছর সিগারেটের ধোঁয়ায় তিন হাজারেরও বেশি লোক ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। তামাকের ধোঁয়াময় পরিবেশে প্রতি বছর প্রায় পনেরো থেকে ত্রিশ লাখ শিশু ও কিশোর নানান**

http://allbengalibooks.blogspot.com

রোগের শিকার হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষক হিসেবে 'র‍্যাডন' মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। এ তেজস্ক্রিয় গ্যাস ঘরের ভিতরে ঢুকছে পানি সরবরাহ, নর্দমা, দেয়ালে ফাটল এসবের মধ্য দিয়ে। বদ্ধ ঘরে র‍্যাডন গ্যাস জমা হতে পারে সহজেই। ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও র‍্যাডন গ্যাসকে দায়ী করা হচ্ছে। র‍্যাডন গ্যাস তামাকের ধোঁয়ার সাথে মিশে পুরো একটি বাড়িকেই বিপজ্জনক করে তুলতে পারে।

শব্দদূষণ

আমরা এক শব্দময় জগতে বাস করছি। শব্দ নেই এমন পরিবেশ আমরা ভাবতেও পারি না। আমরা কথা বলছি কখনও আস্তে, আবার কখনও জোরে। এতে শব্দ তৈরি হচ্ছে। জীবজগতের প্রায় সকলেই কম-বেশি শব্দ তৈরি করছে। শুকনো পাতা মর্মর শব্দ করে ঝড় পড়ে, বিকট শব্দে বাজ পড়ে, সাগর ফুঁসে উঠে মহাগর্জনে–এসব ঘটছে হরহামেশা। এর বাইরেও মানুষ নিজে শব্দ না করেও নিজের প্রয়োজনে শব্দ তৈরির নানা উপকরণ উদ্ভাবন করেছে। রেলগাড়ি ও লঞ্চ-জাহাজ সিটি বজায়, মোটরগাড়ি, কলকারখানা শব্দ না করে চলতে পারে না। শব্দ করছে রেডিও টেলিভিশন। এগুলো এখন আমাদের নিত্যদিনের সাথী।

আমরা শব্দ করছি, শব্দ করছে আরও অনেক জীব। কিন্তু তবুও এ শব্দ যখন বেশি পরিমাণে তৈরি হয় তখনই বিপদের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। শব্দ নিয়ে প্রথম ভাবনা তৈরি হয়েছিল পণ্ডিত পিথাগোরাসের মাথায়-সে ঘটনা খ্রিস্টের জন্মেরও আগে। একদিন পিথাগোরাস পথ চলছিলেন এক কামারের দোকানের পাশ দিয়ে। তাঁর কানে এলো হাতুড়িপেটা লোহার টুকরোগুলোর নানা রকমের শব্দ। আঘাতের ফলে শব্দের এ বিচিত্র খেলা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবনে।

তোমরা কি জান শব্দ প্রতি সেকেন্ডে ৩৫০ মিটার পথ পার হতে পারে। শব্দের কারণে যে কম্পন তৈরি হয় সে কম্পনের হারকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি। একজন সুস্থ মানুষ ২০ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সিতে শুনতে পায়। শব্দ যত কাছাকাছি থেকে করা হবে ততই তার তীব্রতা বাড়বে। তবে শব্দতরঙ্গের চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ২/১০০০ ডাইনের সমান। ডাইন বলতে বোঝানো হয় শক্তির একককে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

একেই শব্দ মাপবার বেলায় ডেসিবেল বা ডিবি বলা হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শতকরা ৫০ ভাগ রোগের উৎস হচ্ছে শব্দ। তাঁরা এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন যে, শব্দের তীব্রতার কারণে রক্তনালীর সংকোচন ঘটে। ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। এতে রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রাও বাড়তে থাকে যা হৃদযন্ত্রের কাজে বাধার সৃষ্টি করে। কলকারখানায় যারা কাজ করে তারা অনেক সময় শব্দ-বধিরতায় ভোগে। এরা যখন শব্দবহুল কারখানা থেকে বের হয়ে আসে তখন বাইরের সাধারণ কথাবার্তা সহজে শুনতে পায় না। শব্দের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি হচ্ছে মানসিক। উচ্চ শব্দ মনের ওপর দারুণ প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। এতে মানুষের কাজ করবার ইচ্ছা ও উদ্যম কমে যেতে পারে।

পরিবেশ ও প্রতিবেশ

উ: একটি প্রতিবেশ গড়ে ওঠে জীব ও জড় দুটি উপাদানকে নিয়েই। প্রত্যেকটি প্রতিবেশই মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটি স্থলে ও জলে দু' জায়গায় গড়ে উঠতে পারে। সূর্য অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপশক্তি প্রতিবেশের মূল শক্তি যুগিয়ে থাকে।

প্রতিবেশ শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে আবাস এবং এ আবাস হচ্ছে বিচিত্র সব জীবের–যারা একে অপরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। অন্য কথায়, এরা একে অপরের সঙ্গে একটা নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ নির্ভরতা কেবল জীবের সঙ্গে জীবের নয়, জীবের সঙ্গে প্রকৃতিরও।

এজন্য তারা পরস্পরের চাহিদার মধ্যে একটা সুষ্ঠু ভারসাম্য তৈরি করে। একটি পুকুরের গভীরে থাকে মৃগেল, তার কিছুটা উপরে থাকে কাতল এবং আরও উপরে রুই মাছ। শোল, বোয়াল এসব রাক্ষুসে মাছ পানির খুব গভীরে না গেলেও সারা পুকুর চষে বেড়ায়। আর কুঁচো, চিংড়ি, ডানকানা, পুঁটি পুকুরের আনাচে কানাচে জলজ উদ্ভিদের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। সেখানে ঠিক ঠিক জায়গাটি বেছে নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে বক, পানকৌড়ি ডুবুরি হয়ে শিকার ধরে আর মাছরাঙা ঘাপটি মেরে বসে থাকে পুকুর পাড়ের নুইয়ে থাকা গাছের ডালে।

মানুষ সকাল-সন্ধ্যা নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করে পুকুর।

http://allbengalibooks.blogspot.com

গোসল করা থেকে বাসন-কোসন মাজা পর্যন্ত। দুনিয়া জুড়ে যে বিচিত্র জীবের বসতি, স্থানভেদে তাদের সংখ্যা বা রকমের খুব একটা সমতা নেই। মেরু অঞ্চলেই জীববৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। এর কারণ হচ্ছে সেখানে জলবায়ুর পবিবর্তন ঘটে খুবই ধীরগতিতে।

প্রতিবেশ সব সময় এক রকম থাকে না। এটি বদলে যেতে পারে এবং বদলে যায়ও। আবার বিভিন্ন প্রতিবেশ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। স্থলজ প্রতিবেশ ও জলজ প্রতিবেশের মধ্যে তৈরি হয় পারস্পরিক সম্পর্ক। অনেক সময় একটি জলধারা স্থল ও জলের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে। একটি উপসাগরের বুকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে দ্বীপাবলি। এমনকি, অনেক দূরে থাকলেও পানি ও বাতাস দুটি প্রতিবেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়তে পারে। আবার প্রাণিকুলও বীজ, পুষ্টি এসব বয়ে নিয়ে বেড়ায়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেশের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক এতই নিবিড় যে, গোটা পৃথিবীটাকে পরস্পর নির্ভরশীল একটি বিশাল প্রতিবেশ বলা চলে।

আর এ প্রতিবেশের অপর নাম হচ্ছে জীবমণ্ডল। কোটি কোটি বছর ধরে জীবমণ্ডলের বিবর্তন ঘটছে এবং এ বিবর্তন সম্ভবত চলতে থাকবে আরও কোটি কোটি বছর ধরে। প্রতিবেশ খুব সহজেই নানা রকম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু তা হলেও আবারও তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কারণ প্রতিবেশের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা ও প্রাণীদের মধ্যে অনেকেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। এ মানিয়ে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে টিকে থাকা এবং এর মধ্যে দিয়ে প্রতিবেশ তার ভারসাম্য বজায় রাখে।

বাহ্যিক কিছু উপাদানও প্রতিবেশে কাজ করে। জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিবেশের স্থিতিতাবস্থা ক্ষুণ্ন করে। তবে বাহ্যিক উপাদানের চাইতে অভ্যন্তরীণ উপাদানই প্রতিবেশের প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বেশি। সমতলের প্লাবনভূমিতে ফিবছর বন্যা হলে সেখানকার প্রতিবেশের প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে। বন্যার পানি সরে গেলে সেখানে গড়িয়ে ওঠে সেই আগের মতোই গাছগাছালি এবং ফিরে আসে পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গেরাও। শীতপ্রধান দেশগুলোতে প্রচণ্ড শীতে এমনটি ঘটতে পারে। তবে তা সাময়িক।

http://allbengalibooks.blogspot.com

বসন্তে আবারও সেখানে আগের অবস্থা ফিরে আসে। দাবানল হঠাৎ করে বৃক্ষরাজির যে ক্ষতি করে কিছুকাল পরে তা পুষিয়ে যায়।

নেতিবাচক ফিডব্যাকের বিপরীত ইতিবাচক কিছু ফিডব্যাকও প্রতিবেশের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধারণক্ষমতাও বেড়েছে। তবে এ ধারণক্ষমতা কতদিন টিকে থাকবে তা বলা কঠিন। বিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেন, কৃষি থেকে ফলনের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও তাকে ধারণ করতে পারবে। কিন্তু আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা এ প্রত্যাশাকে ভুল প্রমাণিত করেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হয়ে ওঠে না বলেই এমনটি হচ্ছে।

যেখানে একটি জীব বংশানুক্রমে টিকে থাকে সেটি তার জন্য যথাযোগ্য স্থান। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'নিশ'। এ যথাযোগ্য স্থানটির অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। একটি প্রজাতির লালন ও বিকাশে এটি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যুগিয়ে থাকে। কাজেই এটি বহুমাত্রিক হতে পারে। দুটি প্রজাতির জন্য একই স্থান যথাযোগ্য হবে এমন কথা নেই। দেহের গঠন ও শারীরিক অবস্থার ভিন্নতার কারণে তাদের প্রতিবেশিক অবস্থানও ভিন্ন হয়ে থাকে। জেব্রা ও জিরাফ একই উন্মুক্ত তৃণভূমিতে বাস করলেও তাদের অবস্থান বা যথাযোগ্য স্থানটি এক নয়। আসলে একই প্রতিবেশে এক-একটি প্রজাতি তার যথাযোগ্য অবস্থাটি বেছে নেয় এবং তার শারীরিক গঠন ও অবস্থাকে তার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। শালিক ও ফিঙে একই প্রতিবেশে বাস করে এবং বেঁচে থাকে পোকামাকড় খেয়ে। কিন্তু তা হলেও ফিঙে ধরে খায় উড়ন্ত পোকা এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার মুহূর্তে ওরা এ কাজে সবচেয়ে তৎপর হয়। অপর দিকে, শালিক ঘাস থেকে অথবা মাটি খুঁড়ে পোকামাকড় ধরে। সকাল ও দুপুরেই ওদের খাবার সংগ্রহে ব্যস্ততা বেশি।

http://allbengalibooks.blogspot.com

খাদ্যচক্র

প্রত্যেকটি প্রতিবেশেই রয়েছে একটি খাদ্যচক্র। এ চক্রের শুরুতে থাকে সবুজ উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য তৈরির কাজে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে ধারণ করে। কাজেই উদ্ভিদই হচ্ছে খাদ্যশৃঙ্খলের প্রাথমিক উৎপাদক। তৃণভোজী প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে উদ্ভিদকে। এ কারণে তৃণভোজী প্রাণীদের বলা হয় প্রাথমিক ভোক্তা। মাংসাশী প্রাণীরা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোক্তা। কারণ তারা তৃণভোজীদের খেয়ে বাঁচে। এভাবে পর্যায়ক্রমে উপবিস্তরের মাংসাশীরা অন্য মাংসাশীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে খাদ্যচক্র গড়ে ওঠে।

মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ, মলমূত্র, ঝরাপাতা, ফুল ও ফলের খোসা, টুকরো টুকরো হয় অথবা তাতে পচন ধরে। পচনকারীদের মধ্যে রয়েছে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, পোকামাকড়, শামুক, শুককীট, ইত্যাদি। উদ্ভিদ সেই পচে যাওয়া পদার্থগুলোকে আবার পুষ্টি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে। যে কোন প্রতিবেশে ভোক্তার চাইতে উৎপাদকের সংখ্যা বেশি থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোক্তার চাইতে বেশি থাকে প্রাথমিক পর্যায়ের ভোক্তা এবং তৃতীয় পর্যায়ের ভোক্তার চাইতে বেশি থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোক্তা। প্রতিটি পর্যায়ে শক্তি কমে যাওয়া এর একটি কারণ।

প্রতিটি স্তরে এ শক্তি কমে যাওয়ার পরিমাণ শতকরা ৯০ ভাগ। আবার মাংসাশীদের তুলনায় তৃণভোজীদের সংখ্যা কমে গেলে তৈরি হবে খাদ্যসংকট এবং তাতে খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারাবে মাংসাশী প্রাণীরা। সংখ্যার দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের উৎপাদক ও ভোক্তাদের সাজালে তা তৈরি করবে একটি পিরামিড।

প্রতিবেশে জীবজগতের আশ্চর্য গ্রন্থিবন্ধন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় পরস্পর নির্ভরশীল জীবনব্যবস্থাকে। এ ব্যবস্থায় কেবল মানুষই পারে জীব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক বদলে দিতে। কিন্তু তা কতটা কল্যাণ বয়ে আনবে তা ভাবতে হবে আমাদের।

http://allbengalibooks.blogspot.com

পাহাড় কেমন করে হল?

পঞ্চাশের দশকে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন দু'জন পর্বত আরোহী তেনজিং শেরপা ও এডমুন্ড হিলারি। এ দু'জন সর্বপ্রথম আরোহণ করেছিলেন হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায়। মাউন্ড এভারেস্ট কেবল হিমালয়েরই নয়, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পবতশৃঙ্গও। এ শৃঙ্গটি ৮৮৬৩ মিটার উঁচু। কেবল দূর থেকে নয়, কাছে থেকে তাকালেও মনে হবে, আকাশ ছুঁয়ে আছে হিমালয়। কারণ হিমালয়ের এপারে বা ওপারে পৃথিবী দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যায়। আর তা আমাদের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুহল জাগে: কেমন করে সৃষ্টি হল হিমালয় অথবা পৃথিবীর আর সব পর্বতমালা?

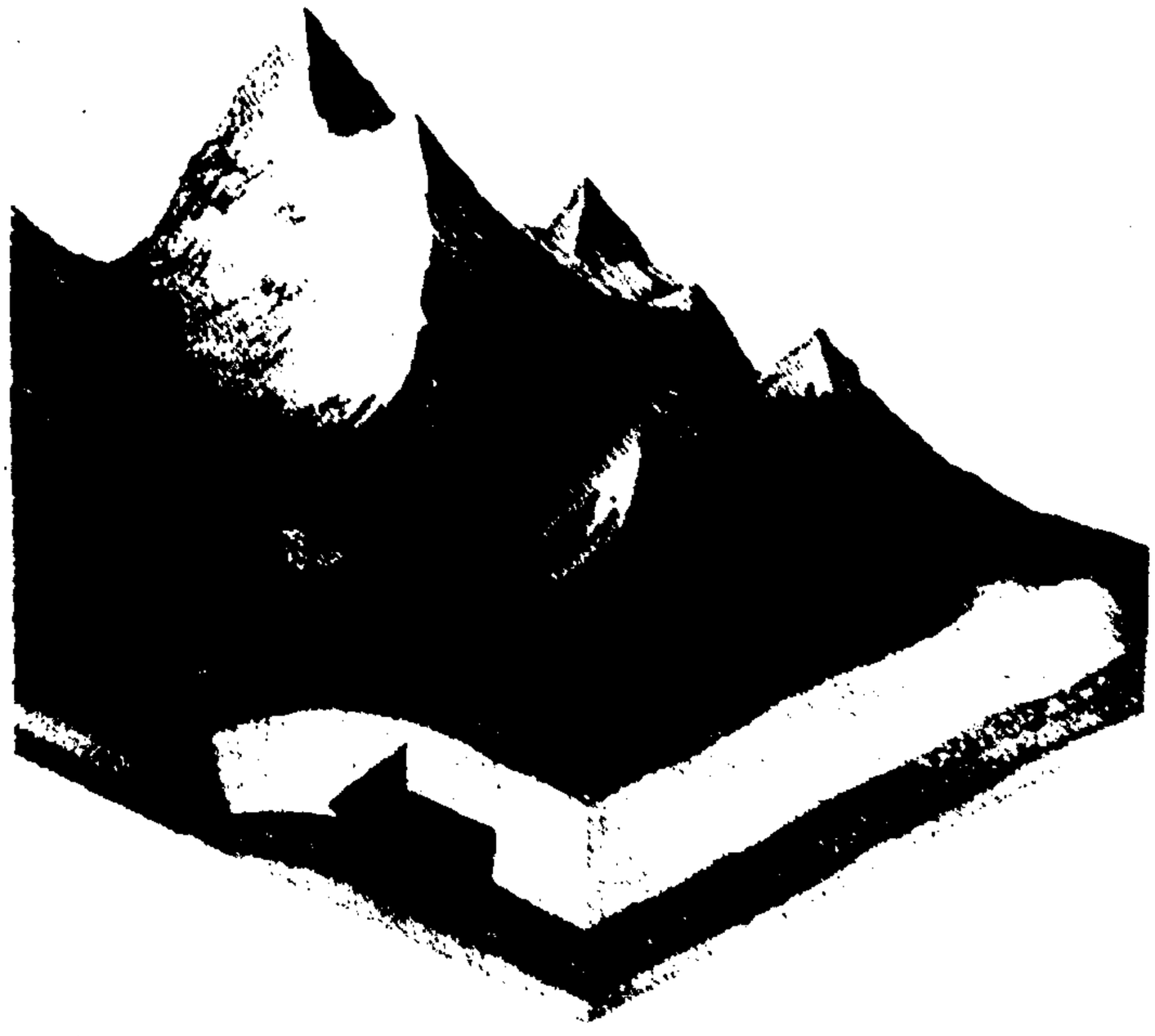

মহাদেশীয় প্লেট

পৃথিবীর উপরিভাগে আমরা **দেখতে** পাই কোথায়ও বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, কোথায়ও বালুকাময় বিশাল মরু অঞ্চল আর কোথায়ও বা অনেক উঁচু খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলার স্তূপ। পবত হচ্ছে এই খাড়া হয়ে ওঠা শিলার তৈরি বিশাল এক একটি অঞ্চল। পবত সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে পৃথিবীর অভ্যন্তর ও উপরিভাগের শক্তিগুলো। ফলে কোনো কোনো পর্বত তৈরি হয়েছে ভূগর্ভস্থ পরিবর্তনের ফলে, কোনো কোনো পবত তৈরি

http://allbengalibooks.blogspot.com

হয়েছে পৃথিবীর উপরিভাগের পরিবর্তনের কারণে। ভাঁজ, স্তরচ্যুতি, উর্ধ্ব-ভাঁজ ও আগ্নেয়গিরির তৎপরতার কারণে এ পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই গঠনের দিক থেকে পর্বতের চারটি ভাগ হচ্ছে–ভঙ্গিল পর্বত, উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত, চ্যুতিস্তূপ পর্বত, আগ্নেয় পর্বত। পৃথিবীর উপরিভাগের পরিবর্তন ঘটছে সেই আদিকাল থেকেই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এক সময় পৃথিবীর গোটা স্থলভাগ ছিল একটি অখণ্ড ভূমি। তারপর ধীরে ধীরে মহাদেশীয় ভূখণ্ড প্লেটগুলো ক্রমেই একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। পৃথিবীর মানচিত্রে দূরে দূরে অবস্থিত মহাদেশগুলোকে কেটে মেলানো হলে একটিমাত্র স্থলভাগের মতোই দেখায়। ধারণা করা হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে তাপের বিকিরণসহ বিভিন্ন কারণে মহাদেশীয় প্লেটগুলো একে অপর থেকে সরে গেছে। কোনো কোনো প্লেট আবার একে অপরের দিকে ক্রমেই এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে এবং এখনও এক ভূখণ্ড অপর ভূখণ্ডকে ধাক্কা দিয়েই যাচ্ছে। তার ফলে কোথায়ও পাহাড় বা পর্বতের সৃষ্টি হচ্ছে, কোথায়ও কোথায়ও পর্বত উঁচু থেকে আরও উঁচু হচ্ছে। এখনও প্লেটগুলোর দূরে সরে যাওয়া কিংবা কাছে চলে আসার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর মাটির এবং সমুদ্রের তলদেশের নিচেও আছে তরল শিলাময় স্তর। কোথায়ও কোথায়ও এই স্তর ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু। এই স্তরের উপর রয়েছে পৃথিবীর প্লেটগুলো। এই প্লেটের তলদেশ অত্যন্ত প্রাচীন কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত বলে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় তাদের তেমন কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। পৃথিবীতে নয়টি খুব প্রাচীন স্থিতিশীল ভূখণ্ড বা প্লেট রয়েছে। এগুলো হল: রাশিয়ার সাইবেরিয়া, চীন (এশিয়া), ভারত, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা, ব্রাজিল, কানাডা ও আফ্রিকা। বিজ্ঞানীদের মতে এসব ভূখণ্ডের কোনো কোনোটির বয়স প্রায় ২৫০ কোটি বছর। এই প্লেটগুলোর প্রান্তসীমা তুলনামূলকভাবে নমনীয় হলেও এর কেন্দ্রীয় এলাকা অনমনীয়। ফলে দুটি মহাদেশ বা প্রাচীন ভূখণ্ড যখন একে অপরকে ধাক্কা দেয় তখন ক্রমেই এ দুয়ের সংযোগ স্থল উঁচু হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টি হয় পর্বতের। এভাবে সৃষ্টি হয় ভঙ্গিল পর্বতমালা। ভঙ্গিল পর্বতমালা সাধারণ কঠিন শিলাবেষ্টিত হয়। বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাচীন মহাদেশীয় প্লেটে যখন অপর মহাদেশীয় প্লেটের ধাক্কা লাগে,

http://allbengalibooks.blogspot.com

তখন দুই মহাদেশীয় প্লেটের কঠিন শিলাগুলোর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এতে শিখাখণ্ডগুলো কুঁচকে গিয়ে ভাঁজ হয়ে উপরের দিকে উঠে পর্বতের সৃষ্টি করে।

কানাডার কুইবেক থেকে দক্ষিণে অ্যালাবামা পর্যন্ত ৪০০ কিলোমিটার জুড়ে এভাবে ভঙ্গিল পর্বতমালার সূচনা হয়। এই পর্বতমালার গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল প্রায় ৪৫ কোটি বছর আগে। পরবর্তী প্রায় ২৫ কোটি বছর ধরে এই পর্বতমালা কেবল বেড়েই চলেছে। সমুদ্রের তলদেশে দুই মহাসাগরের সংযোগ স্থলে উঁচু জায়গা থাকে। কখনও কখনও সেখানে গভীর ফাটল দেখা দেয়।

ফলে দুই মহাসাগর একে অপরের থেকে অনেকখানি দূরে সরে যায়। আবার কখনও কখনও দুই মহাসাগরীয় ভূত্বক দু'দিক থেকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। তখন সমুদ্রতলের শিলাখণ্ড ক্রমেই ওপরের দিকে উঠতে থাকে এবং তারা ভাঁজ হয়ে পর্বতমালার সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর প্লেটগুলো চলমান থাকার ফলে ভূপৃষ্ঠে বা সমুদ্রের তলদেশে কখনও কখনও ফাটল সৃষ্টি হয়। এতে ফাটলের মুখে যে সব শিলা থাকে, তাদের স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে। প্লেটগুলোর চাপ অনুসারে এই স্থানচ্যুতি ঊর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী ও ভূমি বরাবর হতে পারে। প্রত্যেক চ্যুতির দুটি অংশ থাকে। এক পাশ উপরের দিকে উঠে যায়, অপর পাশ নিচের দিকে নেমে যায়। এ রকম অবস্থায় পৃথিবীর ভিতর থেকে সে ফাটল দিয়ে ভূত্বকের ওপরের দিকে বেরিয়ে আসে শিলা। সেই শিলাস্তূপ জমা হয়ে সৃষ্টি হতে পারে অনেক উঁচু পর্বতমালা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইয়োমিং-এর গ্র্যান্ড টেটন এই ধরনের পর্বতমালা।

আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা জমেও অনেক সময় পর্বতের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর যে কোনো স্থানে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া সাগরের তলদেশেও আগ্নেয়গিরি আছে যা থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এবং সে অগ্ন্যুৎপাত থেকে সৃষ্টি হয় পর্বতের। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আগ্নেয়গিরি যুক্তরাষ্ট্রের 'মাউনা লাও' সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,০০০ মিটার নিচে অবস্থিত। তবে এর উদ্‌গীরিত শিলা ও লাভা থেকে সৃষ্ট পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠের ৪,১০০ মিটার ওপরে উঠে গেছে। স্থলভাগে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্ট পর্বত এর নাম ওয়াশিংটন স্টেটের মাউন্ট সেন্ট হেলেন।

http://allbengalibooks.blogspot.com

হিমালয় পর্বতমালা

পর্বত সৃষ্টির পেছনে পৃথিবীর প্লেটগুলোর ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হিমালয় ভঙ্গিল পর্বতমালা। এ পর্বতমালা সৃষ্টিতে কাজ করেছে পৃথিবীর প্রাচীনতম প্লেটগুলোই।

পশ্চিম দিকে পাকিস্তান থেকে পূর্বে চীনের তিব্বত পর্যন্ত ২,৫০০ কিলোমিটার বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালা। প্রস্থে ৩০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে হিমালয় পর্বতমালার আয়তন প্রায় ছয় লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে এর গা ঘেঁষে আছে ভারতের কিছু অংশ, ভুটান ও নেপাল। হিমালয় পর্বতমালায় উঁচু পর্বতের সংখ্যা ৩০টি। এর সবই উচ্চতায় ৭,৩০০ মিটারের বেশি। হিমালয় থেকে সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র নদসহ প্রায় ১৯টি বড় বড় নদ-নদীর উৎপত্তি হয়েছে। কোথায়ও কোথায়ও গিরিখাতগুলো এত গভীর যে, নদীর পানি জলপ্রপাতের মতো ৪,৯০০ মিটার নিচে গিয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর নয়টি প্রাচীনতম প্লেটের মধ্যে আছে এশিয়া ও ভারত প্লেট। ভারত প্লেট ছিল এশিয়া থেকে অনেক দক্ষিণে টেথিস সাগরে। এখন যেটা ভারত মহাসাগর এক কালে তার নাম ছিল টেথিস সাগর। ভারতের তুলনায় এশিয়া প্লেট আকারে অনেক বড়। পৃথিবীর ভিতরের এবং উপরের প্রবল চাপ ও আন্দোলনের ফলে ভারত প্লেট বা ভূখণ্ড ক্রমশ এশীয় প্লেটের দিকে সরে আসতে থাকে।

ভারত ভূখণ্ড যদি নরম ও পাললিক হত, তা হলে এই ভূখণ্ড ধীরে ধীরে এশিয়া মহাদেশীয় ভূখণ্ডের নিচে হারিয়ে যেত। কিন্তু ভারত ভূখণ্ড পুরানো হওয়ায় তা সরাসরি এশিয়া ভূখণ্ডকে ধাক্কা দিতে থাকে। ফলে ভারত ও এশিয়া মহাদেশের প্রান্ত ভাঁজ-প্রক্রিয়ায় উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায়ই হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে। টেথিস সাগর থেকে প্রায় আট কোটি বছর আগে ভারতীয় প্লেট এশিয়ার দিকে সরে যাচ্ছিল। হিমালয় পর্বতমালার গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রায় তিন কোটি ৮০ লাখ বছর আগে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

	পৃথিবীর প্রধান প্রধান পর্বতশৃঙ্গ	
	পর্বত	মিটার
১.	এভারেস্ট (এশিয়া)	৮৮৬৩
২.	গডউইন অস্টিন (এশিয়া)	৮৬১০
৩.	ধবলগিরি (এশিয়া)	৮১৬৭
৪.	চুলমারি (এশিয়া)	৭২৮৫
৫.১	কোঙ্কাগুয়া (দক্ষিণ আমেরিকা)	৭০১০
৫.২	হিন্দুকুশ (এশিয়া)	৭০১০
৬.	হুপসকারাজ (দক্ষিণ আমেরিকা)	৬৬৪৮
৭.	সোরটা (দক্ষিণ আমেরিকা)	৬৪০১
৮.	ইলিম্যানি (দক্ষিণ আমেরিকা)	৬৪০১
৯.	কিম্বিরাজো (দক্ষিণ আমেরিকা)	৬২৪৮
১০.	কিলিমাঞ্জারো (আফ্রিকা)	৫৮৮৩

সে সময় ভারতীয় প্লেটের নরম অংশ এশিয়া প্লেটের সঙ্গে ধাক্কা খেতে শুরু করে। দেড় কোটি বছর আগে এশিয়া ও ভারত প্লেটের শিলাময় কঠিন অংশ পরস্পরকে চাপ দিতে শুরু করে। এই দুটি প্লেটের কঠিন এলাকা ধাক্কা খাওয়ার আগেও ঘটেছে নানা ঘটনা। ভারতীয় প্লেটের উত্তর প্রান্তে ছিল বিপুল পলির স্তর। ভারত যখন এশিয়া প্লেটের দিকে সরে আসে, তখন সেই পলির স্তর স্পর্শ করে এশিয়ার ঢালে। এতে ভারতের প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার এলাকা এশিয়া প্লেটের নিচে চলে যায়।

এ অবস্থার প্রমাণ হিসেবে ভূ-বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন যে, সাধারণত মহাদেশগুলোর নিচে তরল শিলাময় স্তর যেখানে ৩০ কিলোমিটার পুরু। এর ফলে এশিয়া মহাদেশের সংশ্লিষ্ট এলাকার মালভূমিগুলোর উচ্চতাও বেড়ে গেছে। তিব্বতের মালভূমির যে উচ্চতা, তা যুক্তরাষ্ট্রের পর্বতগুলোর উচ্চতার চেয়েও বেশি। প্রায় দেড় কোটি বছর ধরে ভারতীয় প্লেট এশীয় মহাদেশকে চাপ দিয়েই চলেছে। এতে হিমালয় এলাকায় শিলা সঙ্কুচিত হচ্ছে, এর কাঠামো বদলাচ্ছে এবং স্তরচ্যুতিও ঘটছে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

ফলে হিমালয় পর্বতমালার উচ্চতাও ক্রমে বেড়ে চলেছে। ভূ... বলছেন, হিমালয়ের উচ্চতা প্রতি বছর প্রায় পাঁচ মিলিমিটার বাড়ছে। এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী ২০ লক্ষ বছরে হিমালয়ের উচ্চতা আরও ১০ কিলোমিটার বেড়ে যাবে। এতে হিমালয়ের উভয় পাশে জলবায়ু ও পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে। পরিবর্তন দেখা দেবে জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশে। দক্ষিণের দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। হিমালয় উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসকে ঠেকিয়ে রাখছে বলে এই অঞ্চলের আবহাওয়া মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ। বঙ্গোপসাগর থেকে মৌসুমি বায়ু উত্তর দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় হিমালয়ে বাধা পেয়ে উপরে উঠে যায়। তারপর বরফে ঢাকা চূড়ায় বাধা পেয়ে জলীয় বাষ্প বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে নিচে নেমে আসে। হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় বছরে ৩,০০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলের বাতাসে জলীয় বাষ্প নেই। সে কারণে তিব্বতের উত্তরাঞ্চলে মরু অবস্থা বিরাজ করছে। এর প্রভাব পড়েছে চীনেও।

হিমালয়ের পাদদেশের ঘন বনে আছে বিশালকায় হাতি, কৃষ্ণভল্লুক, ডোরাকাটা চিতা, গণ্ডার এবং কালোমুখ হরিণ। বৃক্ষরেখার উপরে ছোট গাছের বনে বাস করে করে ঘন লোমঅলা ইয়াক, বাদামী ভল্লুক ও লাল পাণ্ডা। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার ফলে ব্যাপক ভূমিক্ষয় হচ্ছে। পানির তোড়ে কোটি কোটি টন পলি নেমে আসে নিচের দিকে। ফলে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে বন্যার প্রকোপ।

হিমালয়ে মূল্যবান খনিজ পদার্থও রয়েছে। তার মধ্যে দামী পাথর, লোহার আকরিক আর কয়লা প্রধান। হিমালয় থেকে উৎপন্ন অনেক নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য।

এই পর্বতে রেলপথ বা সড়ক নির্মাণ খুবই কঠিন কাজ। অনেক এলাকার মানুষ সে কারণে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দেয়।

হিমালয় পর্বতমালা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ছোট বড় অনেকগুলো নদী। এগুলোর মধ্যে বড় নদ-নদীর সংখ্যা ১৯। প্রধান দুটি নদী হচ্ছে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে গঙ্গা। পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহীর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে। এখানে এসে গঙ্গার নাম হয়েছে পদ্মা। এটি ক্রমশ

http://allbengalibooks.blogspot.com

দক্ষিণ পূর্ব দিকে গিয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। হিমালয়ের কৈলাশ শৃঙ্গের একটি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। এটি রংপুরের কুড়িগ্রামের উপর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পরে ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জের কাছে দুটি শাখায় ভাগ হয়ে একটি যমুনা নাম নিয়ে গোয়ালন্দের কাছে মিলিত হয়েছে পদ্মা নদীর সঙ্গে। অপর শাখাটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে ময়মনসিংহের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরবে গিয়ে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এসব নদী ও শাখানদী স্রোতের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ পলি বহন করছে। এই পলি জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে।

তবে হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদ-নদী, বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে বর্ষায় যে বিপুল পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয়, তা ভাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশে প্রায়ই বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে শুকনো মৌসুমে পানি সরিয়ে নেওয়ার ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ যেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি হ্রাস পাচ্ছে জীববৈচিত্র্যও। হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত তিব্বত মালভূমি। এ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪ হাজার মিটার উঁচু। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমি। এখানকার আবহাওয়া শুষ্ক ও খুব ঠাণ্ডা।

প্রতিকূল প্রকৃতি

গোটা জীবজগৎ জুড়ে পাশাপাশি বাস করছে মানুষ, বিচিত্র প্রাণিকুল ও উদ্ভিদ। এই জীবজগতের উপাদান হিসেবে কাজ করছে আলো, বায়ু ও পানি। এসব কিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে জীবপরিবেশ। জীবপরিবেশ ধারণ করছে জীবনকে। কখনও কখনও সেই পরিবেশই হয়ে ওঠে জীবনের বৈরী। পরিবেশ থেকে আসে নানা বিপদ আর তাতে বিপন্ন হয় জীবন। প্রকৃতি কখনও আপন নিয়মে তৈরি করে সেই বিপদ, আবার কখনও মানুষ নিজেই নিজের জন্য এবং গোটা পরিবেশের জন্যও তৈরি করে বিপদ। প্রকৃতি থেকে জীবনের জন্য হুমকি হয়ে যে বিপদ আসে তাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বজ্রঝড়, শিলাবৃষ্টি, টর্নেডো, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদীভাঙ্গন, ভূমিধস ও ভূমিকম্প-এ সবই প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট মহাবিপদ, যাকে আমরা বলি দুর্যোগ।

http://allbengalibooks.blogspot.com

বায়ুমণ্ডল একটা বিশাল চাদরের মতো ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে। এ বায়ুমণ্ডল আছে বলে গড়ে উঠেছে জীবজগৎ। সকল জীবেরই শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজন বায়ুর। বায়ুমণ্ডল জীবপরিবেশের অন্যতম নিয়ামক হলেও এখানে এমন সব কাণ্ড ঘটে যা স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলে না। আর এজন্য দায়ী করা হয় বায়ুমণ্ডলের বায়ুপুঞ্জকে।

বায়ুপুঞ্জ বলতে একটি বিরাট এলাকা জুড়ে বায়ুর ধরন বা অবস্থাকে বোঝায়। এক একটি বায়ুপুঞ্জে উপাদানগুলো একই রকমের থাকে। বায়ু যদি চোখে দেখার বস্তু হত তা হলে বায়ুপুঞ্জকে দেখা যেত একটি বিশাল স্তূপের মতো। বায়ুপুঞ্জ বায়ুমণ্ডলের হাজার হাজার কিলোমিটার জুড়ে অবস্থান করে।

স্থলভাগের উপরে যে বায়ুপুঞ্জ গড়ে ওঠে তা থাকে বেশ শুষ্ক। কিন্তু সাগরের উপর গড়ে ওঠা বায়ুপুঞ্জ থাকে ভেজা ভেজা। আবার আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেলে বায়ুপুঞ্জ শীতল হয়ে যায়, অথচ নিচেকার বায়ুপুঞ্জ থাকে উষ্ণ। দুটি বায়ুপুঞ্জের মাঝে যে সীমানা প্রাচীর তাকে বলা হয় বায়ুরেখা। এটি আসলে বায়ুরই একটি পাতলা আবরণ যা ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। দুটি বায়ুপুঞ্জ একটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় না।

এর কারণ হচ্ছে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ ক্রমাগত শীতল বায়ুপুঞ্জকে উপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উষ্ণবায়ুতে পানির কণা থাকে বলেই তা দ্রুত শীতল হয়ে শিশিরাঙ্কে পৌঁছে যায়। আর এর ফলেই তৈরি হয় চূড়ার মতো দেখতে কুণ্ডলী মেঘ বা বজ্রমেঘের। এ মেঘ থেকেই সৃষ্টি হয় বজ্রঝড়ের। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্র পড়ে বলেই একে বলা হয় বজ্রঝড়। মেঘকুণ্ডলী আসলে বিশাল ও বিপুল মেঘমালা যা চূড়ার মতোই দেখায়। এ মেঘকুণ্ডলী ২০,০০০ মিটার ওপরে উঠে যেতে পারে। এ কুণ্ডলী ওপরে উঠতেই শুরু হয় মেঘের দ্রুত আনাগোনা আর তাতে তৈরি হয় বৈদ্যুতিক চার্জ। মেঘকুণ্ডলীর ওপরের দিকে যে বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরি হয় তা হচ্ছে ধনাত্মক আর নিচের দিকের বৈদ্যুতিক চার্জ ঋণাত্মক।

আবার নিচের মাটি থাকে ধনাত্মক। ফলে এ সকল চার্জ মিলে যে বিদ্যুৎ তৈরি হয় তা লাফিয়ে চলে মেঘ থেকে মেঘে এবং কখনো সাথে

http://allbengalibooks.blogspot.com

হয়ে বজ্র ও বৃষ্টি নেমে আসে ভূপৃষ্ঠে। এক একটি বজ্রবিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারে হাজার হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ। বজ্র হচ্ছে শব্দ আর এ শব্দটি তৈরি করে বিদ্যুতের ঝলকানি। এতে বায়ুতে প্রচণ্ড ভার সৃষ্টি হয়। তাপে বায়ু প্রসারিত হলেই তৈরি হয় বজ্র নামের প্রচণ্ড শব্দ।

বজ্রঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত ও শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।

বজ্রপাত চলতে থাকলে বাইরে যাওয়া খুবই বিপদের। পানিতে বা নৌকায় চড়ে কোথাও যাওয়া ঠিক নয়। বাইরে থাকলে ঘন বনের নিচে থাকাই ভাল। একাকী দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু কোন গাছের নিচে থাকলে বিপদ হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড়

উ: সাধারণভাবে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় সমুদ্রপৃষ্ঠে। বায়ুর তাপমাত্রা ও চাপ বেড়ে গেলেই ঘূর্ণিঝড়ের সূচনা ঘটে। শুরুতে ঘূর্ণিঝড় অঞ্চলে বায়ুর তাপমাত্রা ২৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বায়ুর চাপ থাকে ১০০ এম.বি.-এর উপরে। সূচনা পর্যায় থেকে বায়ুচাপের ফলে বাতাসের গতিবেগ বাড়তে থাকে। বাতাসের এই গতিবেগ দ্রুত বেড়ে ঘণ্টায় ১৮৮ কিলোমিটার গিয়ে দাঁড়ায়।

বাতাসের গতিবেগ খুব বেড়ে গেলে তা ঘুরতে থাকে চাকার মতো। এই চাকার মতো ঘোরাটাই হচ্ছে ঘূর্ণি আর এই ঘূর্ণির কেন্দ্রটিকে বলা হয় চোখ। এই চোখ ছয় থেকে পনের কিলোমিটার জায়গা জুড়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড় যখন খুব প্রবল হয়ে ওঠে তখন বাতাসের গতিবেগ বেগে ঘণ্টায় ১১৮ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বায়ুর চাপ ১০০- এম.বি-এর নিচে থেকে যায়।

বাতাসের গতি ও তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ঘূর্ণিঝড়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এদের নাম দেওয়া হয়ে থাকে নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়, প্রবল ঘূর্ণিঝড়, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়।

http://allbengalibooks.blogspot.com

শিলাবৃষ্টি

বজ্রঝড় আর শিলাবৃষ্টি একে অন্যের সঙ্গী। শিলাবৃষ্টি থেকে যে শিলা তৈরি হয় তা আসলে এক একটি বরফের বল। এগুলো নানা আকারের হতে পারে। সাধারণভাবে এক একটি শিলার ব্যাস পাঁচ মিলিমিটার থেকে তিন সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। আকাশ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া ছোট ছোট ইট পাটকেলের মতোই এরা নেমে আসে মাটিতে। শিলা তৈরি হয় বজ্রমেঘের ভিতরেই।

উ: বাতাসের তীব্র বেগে মেঘের ছোটাছুটি শুরু হলেই তার উপরের ছোট ছোট বিন্দু বেশি ঠাণ্ডায় জমে যায়। যখন অনেকগুলো জলবিন্দু শিলার চারপাশে জমতে থাকে তখন এগুলো আরও বড় হয়ে যায়। এতে শিলাগুলোর ভিতরে তৈরি হয় বেশ কয়েকটি স্তর। বজ্রঝড়ে এরা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রীতিমতো ছোটাছুটি শুরু করে। তারপর এক সময়ে নেমে আসে মাটিতে।

টর্নেডো

টর্নেডো তৈরি করে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু। এ ঘূর্ণিবায়ু সরুপথ ধরে চলতে থাকে তীব্র বেগে। চলার পথে যা কিছু সামনে পড়ে তা দুমড়ে মুচড়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় দূর দূরান্তে। টর্নেডো বছরে যে কোনো সময়ে যে কোনো জায়গায় ঘটতে পারে। তবে গ্রীষ্মকালেই এটি বেশি ঘটে থাকে। টর্নেডোর সঙ্গী হতে পারে বজ্রঝড়ও। বজ্রঝড়ে উষ্ণবায়ু খুব দ্রুত উপরে উঠে যায়। ফলে ভূপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি বায়ুতে সৃষ্ট ঘূর্ণিবায়ুর চাপও দ্রুত কমে যায়। তখন আকাশের ওপরে জমে ওঠে কুণ্ডলী মেঘ। সেই মেঘ থেকে হঠাৎ করে নিচের দিকে নেমে আসে চোঙের মতো মেঘ। এই মেঘের চোঙ দেখতে অনেকটা বিশাল হাতির শুঁড়ের মতো। মেঘের চোঙ যখন মাটি স্পর্শ করে তখনই শুরু হয় টর্নেডো নামের ভয়ংকর ঝড়। টর্নেডো উপড়ে ফেলে বড় বড় গাছ, উড়িয়ে নিয়ে যায় কাঁচা ঘরবাড়ি, এমন কি ভেঙেচুরে দিতে পারে পাকা বাড়িঘরও। মোট কথা, যা কিছু টর্নেডোর পথে পড়ে তাকেই সে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। টর্নেডো পড়তা পনেরো মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে এদের কোনো কোনো কয়েক ঘণ্টা ধরেও চলতে পারে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই টর্নেডো দেখা যায়। তবে আমেরিকায় এ ঝড়ের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। সে দেশে প্রতি বছর টর্নেডো হয় গড়ে ৭৮০টি। ১৯৮৯ সনের ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়ায় একটি ভয়ঙ্কর টর্নেডো আঘাত হানে। এতে প্রায় তের শত লোক প্রাণ হারায়। আর ধ্বংস হয় শত শত ঘরবাড়ি, গাছপালা ও ক্ষেতখামার।

সংকেত	ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থা
১	দূর সমুদ্রে অবস্থিত প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বা ঘূর্ণিঝড়ের সূচনা
২	দূর সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি
৩	বন্দরে দমকা হাওয়ার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা
৪	ঝড় বন্দরে আঘাত হানার আশঙ্কা
৫	মাঝারি তীব্রতার ঝড় বন্দরে আঘাত হানার আশঙ্কা
৬	ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির আশঙ্কা
৭	মাঝারি ধরনের ঘূর্ণিঝড়ে বন্দরে তীব্র আবহাওয়ার সৃষ্টি
৮	তীব্র ঝড়ো হাওয়া সম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়
৯	প্রবল তীব্রতা সম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ে বন্দরে ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি
১০	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে মহাবিপদ ঘটার আশঙ্কা
১১	প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আবহাওয়া হুঁশিয়ারি কেন্দ্রের সাথে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

জলোচ্ছ্বাস

উ: সাগরের পানি যখন তার নির্দিষ্ট স্তর ছাড়িয়ে উঁচুতে ওঠে এবং উপকূলের দিকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসে তখন তাকে আমরা বলি জলোচ্ছ্বাস। সাগরে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে প্রবল ঝড়ো বাতাস পাক খেয়ে ছুটে চলে এবং এই ছুটে চলার সঙ্গী হয় সাগরের পানিও। দুটি কারণে জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে, এক ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের কাছাকাছি সমুদ্রপৃষ্ঠে

http://allbengalibooks.blogspot.com

বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে এবং দুই, এর ফলে গভীর সমুদ্রের পানি উপকূলের অগভীর পানিতে উপচে পড়লে। জলোচ্ছ্বাসের ফলে সাগরের পানি কত উঁচুতে উঠবে তা নির্ভর করবে জোয়ার-ভাটার ওপর। জোয়ারের সঙ্গী হলে জলোচ্ছ্বাস অনেক উঁচুতে উঠে যায়। ভাটায় তা হতে পারে না। এই উঁচু পানির স্তরটি ধেয়ে চলে এক থেকে দু'ঘণ্টা সময় ধরে। এ স্তর বা জলোচ্ছ্বাস ৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের থাবা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় খুঁজছে মানুষ। এ উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূল থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বাঁধ দেওয়া, বনায়ন ইত্যাদি। তবে এ উপায়গুলো জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি কমাতে পারে, বন্ধ করতে পারে না।

সাইক্লোন, হারিকেন ও টাইফুন

বিশ্বের নানা দেশে ঘূর্ণিঝড়কে নানা নামে ডাকা হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকাতে এটি নাম নিয়েছে 'হারিকেন'। উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় 'টাইফুন' এবং অস্ট্রেলিয়ায় 'সাইক্লোন' নামে পরিচিত।

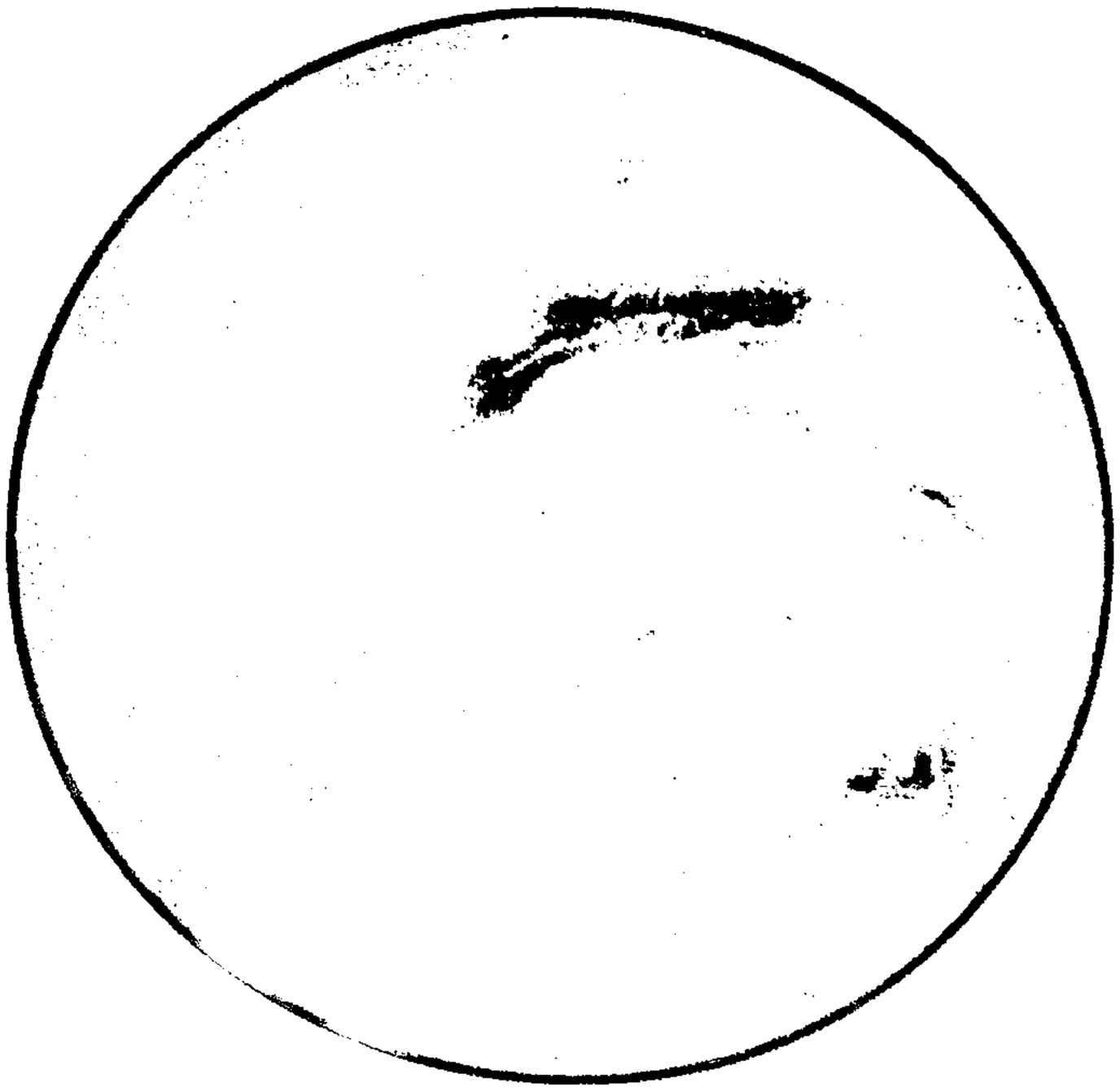

এগুলো আসলে প্রচণ্ড গতির মহাসাগরীয় ঝড় এবং এদের সর্বোচ্চ গতিবেগ সাধারণত ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। তবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে এগুলো ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের

http://allbengalibooks.blogspot.com

ফলে আকাশ মেঘে ঢেকে যায় এবং প্রবল বাতাসের বেগে সে মেঘ আকাশময় ছুটোছুটি করতে থাকে। ফরে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বাতাস বইতে থাকে। বৃষ্টি আর বাতাসের তীব্রতা বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকায় বানও ডাকতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় ও বাংলাদেশ

বিশ্বের সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। বিশ শতকেই সাতটি ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে এদেশের ওপর। গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশের ৩৫ ভাগ এলাকার ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭ মিটারেরও কম। এ ছাড়া অনেকটা ফানেল আকারের দীর্ঘ উপকূল রেখা ঘূর্ণিঝড়ের প্রবলতাকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বাংলাদেশের পনেরটি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ছাড়া উপকূলের অদূরবর্তী দ্বীপসমূহ ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৯টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে বাংলাদেশে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৫ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারিয়েছিল ১ লক্ষ ৩৮ হাজারেরও বেশি মানুষ। আর মারা গিয়েছিল এক লাখেরও বেশি গবাদি পশু। ভিটেমাটি হারিয়েছিল ১০ লাখেরও বেশি মানুষ।

বন্যা

নদী আর বন্যা-এ দুয়ের সম্পর্ক নিবিড়। নদী হচ্ছে একটি বড় রকমের জলাধার। নদীগুলো পৃথিবীর স্থলভাগের মাত্র এক.শতাংশ জুড়ে আছে। অথচ নদীগুলোকে বহন করতে হয় বৃষ্টিতে গড়িয়ে আসা সব পানি এবং সেই সঙ্গে পানিতে মেশানো পলি।

সেই আদিকাল থেকেই আকাশে জমে ওঠা মেঘ থেকে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির পানি নদীর ধারায় মিশে সাগরে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু যখনই বৃষ্টির পরিমাণ অনেক গুণে বেড়ে গেছে, তখন নদীগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বাড়তি পানি নদীর পাড় উপচে ডুবিয়ে দিয়েছে জনপদ।

http://allbengalibooks.blogspot.com

উঃ কেবল বৃষ্টি নয়, পাহাড়ের উপরে জমে থাকা তুষারের স্তূপ যখন অধিক তাপে গলতে শুরু করে অথবা হিমবাহগুলো সরে যেতে থাকে তখনও পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলোর ওপর পানির চাপ বেড়ে যায়। সমতলে নেমে সে সব নদীর পানি তাদের কূল ছাপিয়ে যায়। পানির প্রবল তোড়ে ভেসে যায় শত শত গ্রাম, গঞ্জ ও শহর। এ কারণেই নদীর পানি যখন তার কূল ছাপিয়ে জনপদ ভাসিয়ে নেয় তখন তাকে বলা হয় বন্যা।

নানা ধরনের বন্যা হয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে মারাত্মক আকস্মিক বন্যা। হঠাৎ করে বজ্রঝড় আর প্রবল বৃষ্টি নামল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এল পানির প্রবল ধারা। আর তাকে ভাসিয়ে নিল বাড়ি-ঘর ও ক্ষেতের ফসল, কখনও বা পানির তোড়ে ভেসে গেল মানুষও। আমাদের দেশে সিলেটের হাওড় অঞ্চলে এবং চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি হয়। একে পাহাড়ি ঢলও বলা হয়।

আকস্মিক বন্যা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের বন্যা হচ্ছে আঞ্চলিক বা প্লাবন বন্যা। এ ধরনের বন্যায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এ বন্যা কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে। বন্যার পানি কমতে থাকে ধীরে আর তাতে মানুষের দুর্ভোগও বাড়তে থাকে। গোটা এলাকা জুড়ে খাদ্যবস্তু ও খাবার পানির সংকট সৃষ্টি হয়। নদীর পাড়ে তৈরি রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে গেলেও আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশে কুমিল্লা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী গোমতী নদীর বাঁধ ভেঙে এ ধরনের বন্যার ঘটনা ঘটেছে বহুবার।

নদীভাঙন

নদীভাঙন বলতে মূলত নদীর পাড় ভাঙাকেই বোঝানো হয়। নদীর পাড় ভাঙে। ভাঙনের খেলায় ক্রমশ সরে যেতে থাকে নদী। কখনও এপাড় ভাঙে, ওপাড় গড়ে আবার কখনও নদীর বুকে জেগে ওঠে চর। পালটে যায় নদীর গতি। নদীর স্রোতের গতিবেগ বেড়ে গেলে তা সহজেই আঘাত হানে নদীর তীরভূমিতে। নদীতে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে নদী দ্রুত বেগে ছুটে। এ ছুটে চলাকে সামলাতে পারে না বলেই নদী ভেঙে নিয়ে যায় তার পাড়। নদীর রকমভেদের ওপরও নির্ভর করে নদীর

http://allbengalibooks.blogspot.com

ভাঙন। সরল নদীর চাইতে আঁকাবাঁকা সর্পিল নদীগুলো তীরভূমিতে আঘাত হানে বেশি। আবার বিনুনী নদীগুলোতে চর জেগে ওঠে বলেই নদীর দু পাড়েই ভাঙন ও সঞ্চয়ন-দুইই ঘটতে পারে। নদীভাঙন কি রোধ করা যায়? পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে তা করা যায়। এ জন্য দুটি উপায় রয়েছে। গ্রোয়েন নির্মাণ : নদীর উপর আড়াআড়িভাবে তৈরি কাঠামো বা দেয়াল তৈরি করে নদী শাসন করা। এর ফলে নদীর গতি বদলে যেতে পারে অথবা স্রোতের বেগও কমে যেতে পারে। রাজশাহী শহরে পদ্মা নদীতে এবং সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে গ্রোয়েন নির্মাণ করে এ দুটি শহরকে রক্ষা করা হয়েছে। নদীর পাড়ে আচ্ছাদন তৈরি : নদীর তীরে পাথরের বা কংক্রিটের তৈরি ব্লকের আচ্ছাদন দিয়ে তীর রক্ষা করা হয়। কর্ণফুলী ও পদ্মা নদীর তীরে এ ধরনের আচ্ছাদন তৈরি করা হয়েছে। বদ্বীপ অঞ্চল বাংলাদেশে নদীভাঙন নিত্যকারই একটি সমস্যা। নদীভাঙনে প্রতি বছর এদেশে ১০ লাখের বেশি মানুষ হারায় ঘরবাড়ি ও ফসলের জমি। এই মানুষেরা হয়ে পড়ে পরিবেশ উদ্বাস্তু। বাংলাদেশে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয় ১৯৮৪, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে। বন্যার ফলে নদীর তীরভূমি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা ভাঙনের শিকার হয়। এর পরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। নদীভাঙনের কারণে প্রতি বছর আমাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

ভূমিধস

প্রাকৃতিক কারণে যে সব বিপর্যয় ঘটে তার মধ্যে ভূমিধসও একটি। দুনিয়ার নানা দেশে ভূমিধসের ফলে প্রাণহানি এবং সেই সঙ্গে ঘরবাড়ি ও সম্পদের বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। পাহাড়-পর্বতের খাড়া ঢাল থেকে বড় রকমের শিলাখণ্ড ও মাটির স্তূপ কোনো রকম জানান না দিয়েই হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ে। আবার নানা কারণে পর্বতের ঢালের বড় শিলাখণ্ডগুলো তাদের শক্ত বাঁধন হারিয়ে শিথিল হয়ে পড়ে এবং প্রবল বেগে নিচে নেমে আসে। এই নেমে আসার নামই হচ্ছে ভূমিধস। অতিবৃষ্টি, তুষারপাত ও বরফ গলে যাওয়ার ফলে শিলা ও মাটির ভেতরে পানি প্রবেশের পথ পেয়ে যায়।

http://allbengalibooks.blogspot.com

ফলে তাদের মধ্যকার শক্ত বাঁধুনি শিথিল হয়ে পড়ে। ভূমিধসের আর সব কারণের মধ্যে বনভূমি উজাড় হয়ে যাওয়া, পাহাড়ের ঢালগুলো খাড়া হয়ে যাওয়া ও পাহাড়ের নিচের দিকের মাটি কেটে সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদিও রয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্টে ফাটল সৃষ্টি হয়। এর ফলেও ভূমিধস ঘটে।

খরা

খরা মানেই বিরাট এলাকা জুড়ে বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়া চলতে থাকা। এর ফলে মাটির উপরের পানি শুকিয়ে যেতে থাকে। খাল-বিল ও নদী-নালার পানি কমে আসে এবং মাটির নিচেকার পানির স্তরও নেমে যায়। এতে শস্য ও গাছপালার দারুণ ক্ষতি হয়। পৃথিবীর সব দেশেই খরাকে কৃষির জন্য একটি প্রধান হুমকি হিসেবে গণ্য করা হয়। যে সব দেশে প্রায় প্রতি বছরই খরা হয় তারা আগেভাগেই পানি ধরে রাখে এবং খরায় টিকে থাকতে পারে এমন বিশেষ ধরনের শস্যের আবাদ করে। সাম্প্রতিক কালে কৃত্রিম উপায়ে মেঘ তৈরি করে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা হয়েছে। এ সব চেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি।

আবহাওয়াবিদরা খরাকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে স্থায়ী খরা–এতে নির্দিষ্ট এলাকায় চরম শুষ্কতা বিরাজ করে এবং পানি সেচ ছাড়া কিছুতেই চাষাবাদ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মৌসুমি খরা-বর্ষা ও গ্রীষ্ম ঋতুর নিয়মিত পালাবদলে মৌসুমি খরার সৃষ্টি হয়। ফলে ঋতুর সঙ্গে মিলিয়ে শস্যের আবাদ করা হয় তৃতীয়টি হচ্ছে আকস্মিক খরা। এতে হঠাৎ করেই কোনো এক বছর আবহাওয়া দারুণ শুষ্ক হয়ে পড়ে। এই ধরনের খরা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। চতুর্থ ধরনের খরা হচ্ছে অদৃশ্য খরা। গ্রীষ্মে খুব বেশি রকমের গরমে পানি শুকিয়ে যায় বলে চাষাবাদের কাজে যতটা পানির দরকার ততটা পাওয়া যায় না। ফলে মাটির আর্দ্রতার অভাবে ফসল ফলানো যায় না। খরা উদ্ভিদ ও প্রাণী দুয়েরই বড় রকমের ক্ষতি করে। শস্যহীন প্রান্তরে ধূলিময় মাটি প্রাণিকুলের স্বাভাবিক জীবনাচরণকে বিঘ্নিত করে। বিশেষ করে, গবাদি ও বুনো পশুরা সেখানকার সব উদ্ভিদ সাবাড় করে ফেলে। ফলে খুব জোরে বাতাস বইতে থাকলে উপরের মাটি সরে যায়।

http://allbengalibooks.blogspot.com

আবার এমনও ঘটে থাকে যে, খরার পরপরই শুরু হয় অবিরাম ঝড়বৃষ্টি। ফলে ধুয়ে যায় উপরের মাটি। শস্যের উপযোগী উপরিভাগের এ মাটি সরে যাওয়ার ফলে চাষাবাদে দারুণ অসুবিধা হয়। বাংলাদেশ বারবার খরার কবলে পড়েছে। ১৯৬৫ থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত খরার ঘটনা ঘটেছে বিশ বারেরও বেশি। এর মধ্যে ১৯৮৯ সনে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি খরাটি হয়। ১৯৭৫ সনে দেশের প্রায় ৪৭ ভাগ এলাকা খরার কবলে পড়ে। বাংলাদেশে খরা কবলিত জেলাগুলোর মধ্যে যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও জয়পুরহাট প্রধান।

ভূমিকম্প

পৃথিবীর বাইরের দিকটা কঠিন শিলার তৈরি এবং এর অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে পানি। পৃথিবীর ভিতরের দিকটা খুবই গরম এবং সেখানে প্রায় ৭০ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে গলিত শিলা ও নানা ধাতব পদার্থ। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এসব গলিত শিলা উপরে উঠে আসে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ভূপৃষ্ঠ কঠিন শিলার তৈরি হলেও এটি একটি মাত্র বিস্তৃত শিলাময় ভূভাগ নয়। এটি ভাগ হয়ে আছে নয়টি ভাগে। এদের বলা হয় প্লেট। এ বিশাল প্লেটগুলো খুব ধীর গতিতে চলমান রয়েছে। চলবার সময় দুটি প্লেটের মধ্যে যখন ধাক্কা লাগে তখনই ঘটে ভূমিকম্প। প্লেটগুলো চলমান হলেও বছরের পর বছর ধরে তাদের মধ্যে কোনো রকমের সংঘর্ষ নাও হতে পারে। তবে এটা সত্যি যে, এগুলো রয়েছে প্রচণ্ড রকমের চাপের মুখে। আর এ চাপ যখন চরমে পৌঁছে তখনই প্লেটগুলো একে অন্যকে আঘাত করে। ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা নির্ভর করে প্লেটগুলো কতটা চাপের মুখে রয়েছে তার ওপর। সামান্য ভূকম্পন অনেক সময় বোঝার আগেই শেষ হয়ে যায়। ভাবতে অবাক লাগে, দুনিয়া জুড়ে প্রতি বছরে প্রায় ৮ লক্ষেরও বেশি ভূমিকম্প হয় এবং এর বেশির ভাগই সামান্য ভূকম্পন। বড় ধরনের ভূমিকম্প হয় গড়ে প্রতি বছর আঠারোটি। রিখটার স্কেলে এগুলোর মাত্রা হল ৬ থেকে ৮ পর্যন্ত। ভূমিকম্প গড়ে এক মিনিটেরও কম সময় স্থায়ী হয়। তবে ভূমিকম্প চার মিনিটও স্থায়ী হতে পারে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি সেই সব স্থান যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গলিত শিলা ভূত্বক ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রাচীন রোমান আগুনের দেবতা ভালকান-এর নাম থেকে ভলকানো বা আগ্নেয়গিরি নামটি এসেছে। বিভিন্ন আকারের আগ্নেয়গিরি আছে। সবচেয়ে পরিচিত আগ্নেয়গিরিগুলো ত্রিকোণাকৃতি চোঙের মতো দেখতে, যেগুলো অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্ট লাভা ও ছাই দিয়ে তৈরি হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ আগ্নেয়গিরির নীচে থাকে বিশাল ম্যাগমার উত্তপ্ত গলিত পদার্থের থলে। অগ্ন্যুৎপাতের আগে এসব অঞ্চলে ম্যাগমা জমা হয়।

ম্যাগমার থলে থেকে সরু চোঙের মতো অংশ দিয়ে এগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে।

সব ম্যাগমাই কেন্দ্রের চোঙাকৃতি অংশ দিয়ে বের হয় না, কিছু মূল চোঙের শাখা দিয়েও বেরিয়ে আসে। বড় অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটেছে কয়েকটি আগ্নেয়গিরি থেকে। এগুলোর মধ্যে জাপানের ফুজিয়ামা, ইটালীর ভিসুভিয়াস, মাউন্ট পিলি এবং ফিলিপাইনের মাউন্ট পিনটুভো অন্যতম।

পৃথিবীর জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত। প্রশান্ত মহাসাগরের আশেপাশে এবং ইউরোপ থেকে ইন্দোনেশিয়ার মধ্যবর্তী পূর্ব পশ্চিম বেল্ট অঞ্চলে বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরি রয়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। একদিকে গলিত উত্তপ্ত লাভা বের হয়ে চারদিক ধ্বংস করে, অপরদিকে, গ্যাস, ধোঁয়া আর শিলাচূর্ণ বের হয়ে চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলে।

নীচ থেকে–

– ম্যাগমা চেম্বার বা থলে যেখানে অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে ম্যাগমা এসে জমা হয়।

– শাখা চোঙ দিয়েও ম্যাগমা বাইরে বের হয়।

– লাভার মূল পথ।

– অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে পুরানো আগ্নেয় পদার্থ দিয়ে চোঙের মুখ বন্ধ থাকে।

– অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচণ্ড তাপ ও চাপে সেগুলো টুকরো টুকরো অংশে পরিণত হয় এবং ভেতরের ম্যাগমা সবেগে বেরিয়ে আসে।

http://allbengalibooks.blogspot.com

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিবেশ দূষণ বলতে আমরা কী বুঝি?

২. পরিবেশ দূষণকে আমরা কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি? সেগুলো কি কি?

৩. মাটি দূষণের জন্য দায়ী কি?

৪. পৃথিবীর বেশিরভাগ পানি কোন তিনটি মহাসাগরের দখলে রয়েছে?

৫. উন্নয়নশীল দেশগুলো কৃষি ফলন বাড়ানোর জন্য কি কি দ্রব্য ব্যবহার করছে?

৬. সিগারেটের ধোঁয়ায় কি রোগ হয়? প্রতি বছর কত শিশু-কিশোর এর কবলের শিকার হচ্ছে?

৭. শিলাবৃষ্টি কীভাবে মাটিতে নেমে আসে?

৮. বন্যা কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১. পানি দূষণ রোধের উপায় কি কি?

২. বায়ু দূষণের কারণগুলো উল্লেখ কর?

৩. প্রতিবেশ বলতে কি বুঝ? প্রতিবেশের বর্ণনা দাও?

৪. শব্দ দূষণ কীভাবে হচ্ছে? বিজ্ঞানীদের মতে শব্দ দূষণের ফলে সৃষ্ট রোগসমূহের উল্লেখ কর?

৫. কীভাবে ঘূর্ণিঝড়ের সূচনা ঘটে?

৬. জলোচ্ছ্বাস কাকে বলে? কী কারণে জলোচ্ছ্বাস হয়?

৭. নদী ভাঙন বলতে কি বুঝ? নদী ভাঙন রোধের উপায় কী কী?

http://allbengalibooks.blogspot.com

ভাবনা ও জ্ঞান আশ্চর্য জিনিস বটে!- রূপকথার সেই টাকার মতো-যতই খরচ করা হোক না কেন এর কোন শেষ নেই।

প্রাচীন প্রবচনের ভাষায়: তোমার আমার দুজনের কাছেই যদি একটি করে আপেল থাকে, আর আমরা দুজনেই যদি নিজেদের মধ্যে তা বদলাবদলি করি, তবুও আমাদের একটি করে আপেল থেকেই যায়। কিন্তু তোমার আমার দুজনেরই যদি ভাবনা আর জ্ঞান থাকে, তা যদি আমরা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করি, তাহলে দুজনের প্রত্যেকের ভাবনা ও জ্ঞান হবে দ্বিগুণ বেশি।

ISBN 984 70112 00170

9 847011 200170

http://allbengalibooks.blogspot.com